পাভেল ক্লুশানৎসেভ

টেলিস্কোপ কী বলে

পাভেল ক্লুশান্‌ৎসেভ

টেলিস্কোপ কী বলে

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এ'কেছেন ইয়ে. ভোইশ্‌ভিল্লো, ব. কালাউশিন, ব. স্তারোদুব্‌ৎসেভ
মলাট, ভেতরের মলাট ও নামপত্রের ছবি এ'কেছেন ইউ. কিসিলিওভ

পাঠকদের প্রতি

পৃথিবীর শেষ কোথায়, পৃথিবীর চারধারে কী আছে, চাঁদ আর তারা — এরা কি অনেক দূরে, তারাগুলো এত সুন্দর কেন, বল্‌ কেন মাটিতে এসে পড়ে, গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ কেন বেশি হয়, চাঁদ কেন একটা ফালির মতো দেখায় বা পৃথিবীর বাইরে আর কী কী জগৎ আছে — এই রকম নানা কথা তোমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে হয়।

এই সব প্রশ্নের এবং এছাড়াও আরও বহু প্রশ্নের উত্তর তোমরা পাবে পাভেল ক্লুশান্‌ৎসেভ-এর 'টেলিস্কোপ কী বলে' বইতে।

©বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · 'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো · ১৯৮৬

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-000727-5

পৃথিবীর শেষ কোথায়?

গ্রীষ্মকালে মাঠে দিব্যি লাগে! ফুলের সুগন্ধ, নির্মল বায়ু, আর চারধারে অনেক অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।

আর যদি ছুটে কোন টিলার ওপর গিয়ে উঠতে পার তাহলে দেখতে পাবে আরও অনেক দূরে। ঐ ওখানে মাঠের শেষ। মাঠের ওপারে ঘন বন। পাশে ঝলমল করছে সরোবর, এ'কেবে'কে পথ চলে গেছে। তারও পরে আবার মাঠ, অন্য একটা মাঠ। আর তার ওপারে সম্ভবত আবার বন, আবার পথ, সরোবর, নদী, নগর।

মনে হয় পৃথিবীটা যেন একটা বিশাল চ্যাপ্টা গোল রুটি — তাই না?

আর এই রুটিটার মাথার ওপর ছেয়ে আছে আকাশ — যেন একটা বিশাল ছাউনি। দিনের বেলায় ছাউনিটা দেখায় নীল, রাতের বেলায় — কালো। আর তার গায়ে একে একে জ্বলে ওঠে তারা — যেন দূরের বাতি।

থিয়েটার-হলের মাথার ওপরকার ছাদটা বড় বটে। কিন্তু তার সঙ্গে এ ছাউনিটার কোন তুলনাই চলে না। এটা হাজার-হাজার গুণ বড় আর উ'চু।

এই ছাউনিটা দেখে মনে হয় যেন গোল, একটা বিশাল গম্বুজের মতো। যেন এর কানাগুলো সোজা এসে স্পর্শ করেছে এই চ্যাপ্টা রুটিটাকে — আমাদের পৃথিবীকে। আর পৃথিবীর বুকে যদি একটা দিক ধরে খুব বেশিক্ষণ হাঁটা যায় তাহলে বুঝি একসময় আমরা সেই জায়গাটায় পেণছে যেতে পারব যেখানে আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে এসে মিলেছে। ঠিক এরকমই একটা বর্ণনা আছে 'কু'জো টাট্টু' রূপকথায়:

> ...কাছে নাকি দূরে, নীচে না ওপরে
> কোথা দিয়ে কোথা জানা নেই, ওড়ে।
> যে-কথাটা শুধু বলি শোনো জানা —
> ঘোড়া নাকি ছুট দিল মেলে ডানা
> সেথায়, যেখানে শুনি লোকমুখে
> আকাশ মিলেছে পৃথিবীর বুকে।
> কিষানীরা সেথা সুতো কাটা হলে
> চরকা যে যার আকাশেতে তোলে।
> উঠল আকাশে ইভান সেথায়,
> ধরা জননীরে জানিয়ে বিদায়।
> চলল যেন সে রাজার কুমার,
> উৎসাহ, তেজ ধরে না ক আর!

আহা, সত্যিই যদি এমনটি হত! দিব্যি চললে আপন মনে পৃথিবীর বুকে হাঁটতে হাঁটতে, একটা পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠলে, কিংবা কোন একটা ছোট্ট নালা ডিঙোলে — ব্যস,
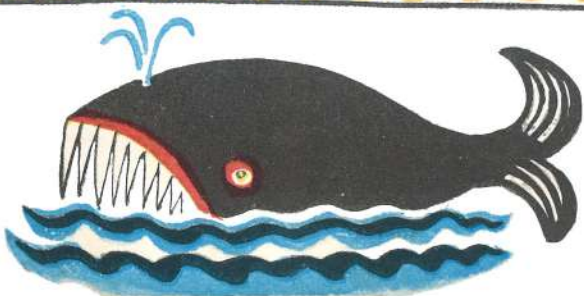
তারপরই চললে মেঘমুলুকের ভেতর দিয়ে। ওপর থেকে কেবল তারিফ কর বন আর মাঠের, তার মধ্য থেকে খুঁজে বার কর তোমার বাড়ি।

আফশোসের কথা, এটা সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রাচীনকালে লোকে মনে করত সম্ভব। সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করত। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে আকাশ হল একটা বিরাট উপুড়-করা পেয়ালা, আর পৃথিবীটা এক বিশাল চাপাটি, যে-কোন চাপাটির মতো তারও কিনারা আছে। বলাই বাহুল্য, এর পরে, 'পৃথিবীর সীমানার ওপারে', 'আকাশের অন্য ধারে' কী আছে — এসব জানতে বড় কৌতূহল হত তাদের।

কিন্তু পায়ে হেঁটে, গাড়িতে চেপে মানুষ যত দূরেই যাক না কেন 'পৃথিবীর সীমানা' দেখার সাধ্যি তার কোন কালেই হল না — এমনকি দূর থেকেও না।

লোকে তখন এটাই ধরে নিল এই যে চাপাটি-আকারের জিনিসটার ওপর আমরা বাস করি সেটা সম্ভবত অনেক বড়। হয়ত অনেক দূরে, উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বতের ওধারে, বনজঙ্গল ও সাগর-মহাসাগর ছাড়িয়ে কোথাও তার কিনারা আছে এবং কুঁজো টাট্টুর সাহায্য ছাড়া ওখানে পেঁছানো খুব কঠিন।

কুঁজো টাট্টু

কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের কৌতূহল যাবার নয়। লোকে ভাবল, আচ্ছা, চাপাটিমাত্রেই ত কিছু-না-কিছুর ওপরে থাকে — শূন্যে ত আর ঝুলতে পারে না! এমন কথা ভাবলেও হাসি পায়। তার মানে, পৃথিবীও কিছু-না-কিছু একটার ওপরে আছে। কিন্তু কিসের ওপরে যে আছে সেটা কোনমতেই জানা গেল না।

এদিকে আবার মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হওয়ায় ব্যাপার আরও ঘুলিয়ে যায়। পৃথিবী তখন দুলতে থাকে, পাহাড়-পর্বত ফেটে যায় ধসে পড়ে, সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ে তীরের ওপর। তোমার গায়ের কম্বলের ওপরে যদি কয়েকটা বেড়ালছানা থাকে, আর তুমি যদি কম্বলের নীচে হঠাৎ পাশ ফিরে শুতে যাও তখন তাদের যে দশা হয় ভূমিকম্পের সময় মানুষের অবস্থাটাও হয় সেরকম।

এ থেকে লোকের ধারণা হল পৃথিবী হয়ত অবস্থান করছে শক্তিশালী ও প্রকান্ড-প্রকান্ড দৈত্য-দানবের পিঠের ওপর। ঐ দৈত্য-দানবেরা যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে ততক্ষণ সব ঠিক আছে; কিন্তু যে মুহূর্তে তারা নড়েচড়ে ওঠে তখনই শুরু হয় ভূমিকম্প।

লোকে এই সিদ্ধান্তে এলো যে পৃথিবী অবস্থান করছে তিনটি প্রকাণ্ড তিমির ওপর, কেননা তিমির চেয়ে বড় কোন জন্তু দুনিয়ায় নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হল পৃথিবী যদি তিমির ওপর অবস্থান করে তাহলে তিমি অবস্থান করছে কিসের ওপর?

লোকে মনে মনে ভাবল তিমি মহাসাগরে সাঁতার কাটে। তিমিরা যে চিরকালই মহাসাগরে সাঁতার কাটে!

আচ্ছা, মহাসাগর তাহলে কিসের ওপরে আছে?

আছে পৃথিবীর ওপরে।

আবার বলা হচ্ছে কিনা পৃথিবী আছে তিমির ওপরে?

না, না, এটা যেন কেমন গোলমেলে ঠেকছে। এর কোন শেষ নেই। এ যেন মুরগী আর ডিমের গল্পের মতো — কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে?

তখন লোকে বলতে শুরু করল: 'পৃথিবী আছে তিনটি তিমির ওপরে — এই হল মোদ্দা কথা। এটা যদি তোমার যথেষ্ট বলে মনে না হয় তাহলে যাও, নিজে গিয়ে দেখে এসো।'

আজকের দিনে আমাদের দৃষ্টিতে যত হাস্যকরই মনে হোক না কেন, সেকালে লোকে কিন্তু এই সব আজগুবি গল্পে বিশ্বাস করত; কারণ লোকে স্পষ্ট ভাবে কিছুই জানত না, আর এমন কেউ ছিলও না যার কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে।

প্রাচীনকালে মানুষ পৃথিবীর বুকে বড় বড় দূরত্ব পাড়ি দিতে পারত না। রেলগাড়ি আর এরোপ্লেন ত দূরস্থান, পথঘাটই ছিল না, না ছিল মোটরগাড়ি, না জাহাজ। এই কারণে তিমি-সংক্রান্ত গল্পকথার সত্যতা যাচাই করে দেখার জন্য যে 'পৃথিবীর শেষপ্রান্তে' যাবে সে উপায়ও ছিল না। তাসত্ত্বেও লোকে একটু আধটু করে ভ্রমণ করতে লাগল। উটের পিঠে চেপে তারা বেশ দূরে দূরে জায়গায় অভিযানে যেতে শুরু করল, বড় বড় নৌকায় চেপে নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগর পার হতে লাগল।

পথ যাতে গোলমাল না হয় তার জন্য ভ্রমণকারীরা এখন থেকে তাদের পায়ের নীচে না তাকিয়ে মাথার ওপরের আকাশ দেখে। তা নইলে সমুদ্রের বুকে যেখানে চারদিকে কেবল জল আর জল, সেখানে লোকে কী করেই বা পথ খুঁজে পাবে? কিংবা ধর মরুভূমিতে, যেখানে চারদিকে কেবল বালি আর বালি — একই বালি? কিন্তু সূর্য, চন্দ্র ও তারা কী সাগরে, কী মরুভূমিতে — সর্বত্রই দেখা যায়। দেখা যায় বনজঙ্গলের ভেতর থেকে, এমনকি পাহাড়ের খাদের তলা থেকে। তাছাড়া সূর্য-চন্দ্র-তারা সব সময় নিজের নিজের জায়গায় আছে। এই সময় 'ধ্রুবতারা' কথাটির উদ্ভব।

সূর্য-চন্দ্র-তারা সব সময় একই পথে আকাশে চলে। যেমন ধর, এমন কখনই হয় না যে সূর্য চলে গেল পেছনে, ডান দিক থেকে বাঁয়ে; কিংবা চাঁদ উঠে আকাশে স্থির হয়ে থেকে গেল; অথবা তারাগুলো লাফিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে উঠল। প্রতি দিন, প্রতি বছর সূর্য-চন্দ্র-তারা আকাশপথে চলে ধীরস্থির শান্ত গতিতে, ঘড়ির কাঁটার মতন।

বজ্র বিদ্যুৎ, ঝড়ঝঞ্ঝা, তুফান — যাই হোক না কেন সূর্য-চন্দ্র-তারার তাতে কিছুই আসে যায় না, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওরা ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় আকাশপথে চলে বেড়ায়।

লোকে মনে মনে ভাবল, আকাশের ওপারে কোথাও হয়ত খুব জটিল ও মাথাওয়ালা কোন যন্ত্র লুকানো আছে। এই যন্ত্রটা হয়ত ঘড়ির যন্ত্রব্যবস্থার মতো। সেখানে হয়ত পাহাড়প্রমাণ বিশাল বিশাল খাঁজকাটা চাকা ধীরে ধীরে ঘুরছে। আর ওগুলোই এই প্রকাণ্ড ভারী জিনিসটাকে — তারাদলসমেত গোটা আকাশকে স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘুরিয়ে পৃথিবীর মাথার ওপর তোলে। আকাশটা নিশ্চয়ই বেজায় ভারী। যা প্রকাণ্ড!

আহা, একবার যদি 'পৃথিবীর শেষপ্রান্তে' পৌঁছানো যেত, কোন কিছু দিয়ে আকাশটা ফুটো করে একবার যদি দেখা যেত ওখানে কী আছে! কী দারুণই না হত!
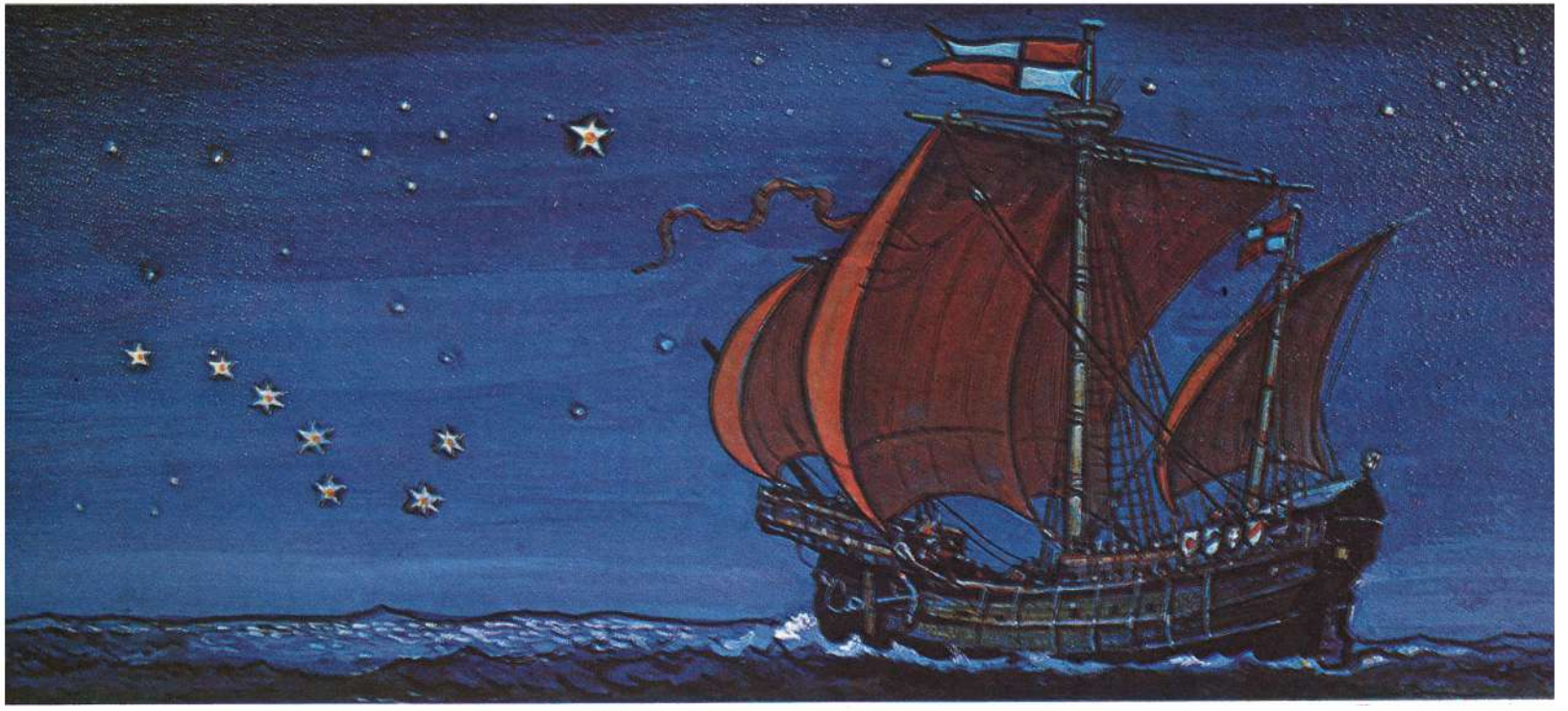
তোমরা হাসবে না। লোকে কিন্তু সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করত যে আকাশের ওধারে এইরকম 'চাকা' আছে।

কিন্তু সে যাই হোক না কেন, লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেল যে আকাশে চিরকাল পরিপূর্ণ নিয়মশৃঙ্খলার রাজত্ব চলছে এবং 'জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর' ওপর নির্ভর করা যায় — এরা কখনও মানুষকে ডোবাবে না। এই বিশ্বাসের ফলে মানুষের পক্ষে দূর দূর দেশে যাত্রা সম্ভব হল।

যেমন দিনের পর দিন অস্তগামী সূর্যের দিক লক্ষ করে চলেছে ভ্রমণকারীরা, তারা জানে যে সর্বক্ষণ চলেছে একই দিকে, আর বলাই বাহুল্য ভুল তাদের কখনও হত না।

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে যখনকার কথা বলছি সেই সময় না ছিল দিগদর্শনযন্ত্র, না কোন মানচিত্র, না আলোকস্তম্ভ।

এই ভাবে তারার দিকে দৃষ্টি রেখে ভ্রমণ করতে গিয়ে লোকে এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করল।

লোকে হয়ত তাদের জন্মস্থান থেকে উটের পিঠে চড়ে বেরিয়েছে দূর যাত্রায়, কোন একটা উজ্জ্বল তারাকে যাত্রার সময় মনে করে রেখেছে; পথে যাত্রীদের একদিন দু'দিন করে সপ্তাহ কাটে, ওরা লক্ষ করে যে প্রতি রাতেই ওদের সেই তারাটা দিকচক্রবালের আরও বেশি ওপরে দেখা যাচ্ছে। দেখেশুনে মনে হয় যাত্রীরা চেপ্টা সমতল ভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছে না, যেন একটা বিশাল গড়ানে টিলা পার হয়ে চলেছে, যত সামনে চলেছে ততই তার ওপারে, আরও বেশি দূর তাদের চোখে পড়ছে। আবার বাড়ি ফেরার পথে ঘটে তার উলটোটা — তারাটা রোজই একটু একটু করে নীচে নামছে, মনে হয় যেন ওরা তারাটা থেকে টিলার ওপারে ফিরে চলে যাচ্ছে।

লোকে তখন বিবেচনা করল, তাহলে একটা বিশাল গোল রুটির মতো পৃথিবীর পিঠটাও ফোলা, বাঁকানো।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে দেখা গেল সমুদ্রের জলও ঐ রকম বাঁকানো। কেবল সমুদ্রযাত্রী নাবিকেরা নয়, সমুদ্রতীরে বসবাসকারী লোকেরাও এটা লক্ষ করে। জাহাজ যখন সমুদ্রের বুকে যাত্রা করে তখন তীর থেকে লক্ষ করলে তারা সব সময় প্রথমে দেখতে পায় গোটা জাহাজটা, তারপর কেবল জাহাজের পাল, পরে কেবল মাস্তুলের মাথা। আর সব শেষে জাহাজটা একেবারে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। মনে হয় যেন পাহাড় পেরিয়ে ওধারের ঢাল বয়ে নেমে গেল।

কোন সমুদ্র বা হ্রদের ধারে দাঁড়ালে তোমরা নিজেরাও অনায়াসে এটা যাচাই করে দেখতে পার। তবে হ্যাঁ, খেয়াল রাখতে হবে জল যেন শান্ত থাকে, বড় বড় ঢেউ যেন না থাকে। জলের দিকে নীচু হয়ে জাহাজের ওপর নজর রাখবে। দেখবে, পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে জাহাজের নীচের অংশ জলে ঢাকা পড়ে যেতে শুরু করেছে। আর ডজন কয়েক কিলোমিটার দূরে যাওয়ার পর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই কারণে দূরবীন দিয়ে দেখা ভালো।

সমুদ্র যে উত্তল এটা মেনে নেওয়া সেকালের মানুষের কাছে শক্ত ছিল।

কিন্তু শেষকালে না মেনে আর উপায় রইল না। এর পর থেকে লোকে পৃথিবীকে আর চ্যাপ্টা চাপাটি বলে ভাবে না; এখন তাদের ধারণা হল পৃথিবীটা একটা অর্ধগোলকের মতো, আর তার পিঠটা কোন এক অজ্ঞাত কারণে সমুদ্র দিয়ে 'লেপা'।

কিন্তু অর্ধগোলক হলেও তার প্রান্ত ত থাকবে। অথচ লোকে সমুদ্রের বুকে কত দূরে গেছে, পায়ে হেঁটে কত দূর দূর দেশেই না ভ্রমণ করেছে, কিন্তু কারও পক্ষেই 'পৃথিবীর শেষপ্রান্ত' নামে অভিশপ্ত জায়গাটা দেখা সম্ভব হয় নি — এমনকি দূর থেকেও না।

আরও একটা ব্যাপারে লোকে মাথা ঘামিয়ে কূল পায় না। আচ্ছা, সূর্য-চন্দ্র-তারা — এরা ত রোজ কোথায় যেন নেমে যায়, পৃথিবীর ও প্রান্তে ডুব দেয়, আবার পর দিন অন্য দিক থেকে উঠে আসে। শুধু তা-ই নয়, এমন কখনই ঘটে না যে পৃথিবী যার ওপর ভর দিয়ে আছে সেই ঠেকনাটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ওরা আটকে গেল। তারাগুলোও সবাই যে যার জায়গায় আছে। আর সূর্য ও চাঁদ এরাও ঠিক সময়মতো নিয়মিত পূব দিকে উঠছে।

লোকে তখন ভাবতে শুরু করল, আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে যে পৃথিবীর ঠেকনা বলে আদৌ কিছু নেই? পৃথিবীটাও অর্ধগোলক নয়, আসলে একটা গোলক? আর এই গোলকটা কোন এক মায়াবলে বিনা অবলম্বনে ঝুলছে?

তা-ই যদি হয় তাহলে পৃথিবীর কোন কিনারা কেন নেই, কেনই বা সূর্য রাতের বেলায় অমন স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর নীচে চলে যায় — এ সব রহস্যের সমাধান অনায়াসে হয়ে যায়।

দুর্বোধ্য থেকে যায় কেবল একটা জিনিস — পৃথিবীর ওপাশে মানুষ তাহলে কী অবলম্বন করে আছে? তাদের ত মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে থাকার কথা!

শত শত বছর কেটে গেল — লোকে শেষকালে বড় বড় জাহাজ বানাতে শিখল। ঐ সব জাহাজে চেপে মহাসাগর পাড়ি দেওয়া ভয়ের ব্যাপার নয়। লোকে এখন জাহাজে চড়ে ভূপ্রদক্ষিণ করতে পারে। এই ভাবে ভূপ্রদক্ষিণ করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় হল যে পৃথিবী একটা গোলক। মানুষ বুঝতে পারল যে পৃথিবীতে কেউই মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে থাকে না। কারণ এই যে 'নীচ' বলতে যা বোঝায় সেটাও এই পৃথিবীই।

এখন অবশ্য আমরা সবাই একেবারে ছোট বয়স থেকে জানি যে পৃথিবী হল গোলক। যে-কোন বাড়িতে, যে-কোন স্কুলে ভূগোলক আছে। অথচ গোড়ায় মানুষের পক্ষে এটা অনুমান করা কী শক্তই না ছিল!

আকাশের তারা এত সুন্দর কেন?

কোন এক সুন্দর সন্ধ্যায়, যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, এসো, সেই সময় মাঠে যাওয়া যাক, কিংবা যাওয়া যাক সমুদ্রের তীরে, কোন একটা খোলামেলা জায়গায়, যেখানে ঘরবাড়ি বা গাছপালা আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে নেই। আরও দেখতে হবে সেখানে যেন কোন রাস্তার আলো না থাকে, জানলার বাতি চোখে না পড়ে। মোটকথা জায়গাটা হতে হবে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ! আকাশে কত তারা! সবগুলো কেমন ধারাল-খরশান। দেখে মনে হয় যেন একটা কালো চাঁদোয়ার গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে ছোট ছোট ছেঁদা করা হয়েছে আর সেগুলোর আড়ালে ঝিকমিক করছে নীল-নীল আলো।

আর তারাগুলো কতই না বিচিত্র! ছোট, বড়, নীলচে, হলদেটে; কতক তারা সম্পূর্ণ একা, বিচ্ছিন্ন, আবার কতকগুলো একসঙ্গে ছোট ছোট ঝাঁকবাঁধা, একেকটি গুচ্ছ।

এই 'ঝাঁকগুলোকে' বলা হয় 'নক্ষত্রপুঞ্জ'।

এই আজ আমরা যেমন তারাভরা রাতের আকাশ দেখছি, হাজার হাজার বছর আগেও লোকে তেমনি দেখত।

দিগ্‌দর্শনযন্ত্র, ঘড়ি আর ক্যালেন্ডারের কাজ তখন করত আকাশ। যাত্রীরা তারার অবস্থান দেখে দিক ঠিক করত। তারা দেখে লোকে জানতে পারত সকাল হতে আর কত দেরি আছে। তারা দেখে ঠিক করত কখন বসন্ত আসছে।

আকাশ সব সময়, সর্বক্ষেত্রে মানুষের কাজে লাগত। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বহুক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখত তাকে, তার তারিফ করত, তাকে দেখে আশ্চর্য হত, আর ভাবত, কেবলই ভাবত।

তারারা আসলে কী? কী ভাবে আকাশে তাদের আবির্ভাব ঘটল? কেনই বা আকাশে ওরা ঠিক এই ভাবে ছড়িয়ে পড়ল, অন্য কোন রকম ভাবে নয়? নক্ষত্রপুঞ্জের অর্থ কী?

রাতের বেলায় চরাচর শান্ত — বাতাস পড়ে আসে, গাছপালার পাতা সরসর আওয়াজ করে না, সমুদ্র শান্ত। পশুপাখি নিদ্রামগ্ন। মানুষও। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন আকাশের তারার দিকে তাকানো যায় তখন আপনাআপনিই মাথার ভেতরে এসে ভিড় করে রাজ্যের রূপকথা — একটি আরেকটির চেয়ে সুন্দর।

প্রাচীনকালের মানুষেরা তারাদের নিয়ে অসংখ্য কল্পকাহিনী আমাদের জন্য রেখে গেছে।

ঐ যে দেখতে পাচ্ছ সাতটি উজ্জ্বল তারা? আমরা ওগুলোর একটা ছবি এ'কেছি। আকাশের গায়ে বিন্দু দিয়ে যেন একটি চাটু আঁকা হয়েছে।

প্রাচীনকালে চীনদেশে এই নক্ষত্রপুঞ্জকে তাই বলা হত 'পে-তেউ', যার অর্থ হল চাটু বা কোষা। মধ্য এশিয়ায় ঘোড়া

অনেক ছিল বলে এই তারাগুলোকে বলা হত 'খুঁটি বাঁধা ঘোড়া'। আর আমাদের এই অংশে এর নাম 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' বা 'ঋক্ষমণ্ডল'।

বলাই বাহুল্য, ঋক্ষ বা ভালুক আর কোষার মধ্যে মিল খুব একটা নেই। মিলের একমাত্র কারণ ভালুকের খাটো লেজ।

কল্পকাহিনীতে কী না হয়! প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা এরকম একটা কাহিনী ফেঁদেছিল।

এক সময় আর্কাদিয়া দেশে লাওকোওন নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। কাল্‌লিস্তো নামে তাঁর এক কন্যা ছিল। সে ছিল পৃথিবীর সেরা সুন্দরী মেয়ে। এমনকি দেবীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সুন্দরী সেই হেরার সৌন্দর্যও তার কাছে ম্লান হয়ে যায়। দেবী হেরা তাই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনীর

উপর ক্রুদ্ধ হলেন। হেরা মায়াবিনীর মতো যা খুশি তাই করতে পারতেন। তিনি ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন সুন্দরী কাল্‌লিস্তোকে একটা কদর্য মাদী-ভালুকে পরিণত করবেন। হেরার স্বামী, সর্বশক্তিমান দেবতা জেউসের ইচ্ছে ছিল অসহায় কুমারী মেয়েটাকে সাহায্য করেন, কিন্তু তিনি দেরি করে ফেললেন। দেখেন কাল্‌লিস্তো নেই। তার জায়গায় মাথা নীচু করে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে একটা কদাকার লোমশ জন্তু।

সুন্দরী মেয়েটার জন্য জেউসের দুঃখ হল। ভালুকটাকে তিনি লেজে ধরে আকাশে টেনে নিয়ে এলেন।

টেনেছিলেন তিনি অনেকক্ষণ ধরে, সর্বশক্তি দিয়ে। এই কারণে ভালুকের লেজ লম্বা হয়ে গেল।

আকাশে টেনে আনার 'পর লম্বা-লেজ, কুৎসিত চেহারার মাদী-ভালুকটাকে তিনি পরিণত করে দিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জে। এর পর থেকে প্রতি রাতে লোকে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়, মুগ্ধদৃষ্টিতে এই নক্ষত্রমণ্ডলী দেখে আর সুন্দরী কিশোরী কাল্‌লিস্তোকে স্মরণ করে।

আকাশে ঋক্ষমণ্ডলের কাছাকাছি জ্বলছে ধ্রুবতারা। তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। আমাদের ছবিতে যেমন আঁকা আছে, আকাশে ঋক্ষমণ্ডলের দুটি প্রান্তিক তারার মাঝখান দিয়ে একটা রেখা কল্পনা কর। তারপর এই রেখাটির ওপর দিয়ে ঋক্ষমণ্ডলের তারাগুলোর মাঝখানের সমান দূরত্বে পাঁচটি বিন্দু আঁকো। তাহলেই পেয়ে যাবে ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা অবশ্য তেমন একটা উজ্জ্বল নয়। ধ্রুবতারা উত্তর দিক নির্দেশ করে।

আকাশের অন্য দিকে আছে ছোট ছোট তারার একটি পুঞ্জ। এদের নাম কৃত্তিকা। দেখে মনে হয় যেন পুকুরে কতকগুলো

অসহায় হাঁসের বাচ্চা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এক জায়গায় এসে জড় হয়েছে। সংখ্যায় এরা ছয়টি।

এই কৃত্তিকা, ধ্রুবতারা ও ঋক্ষমণ্ডল নিয়ে প্রাচীনকালে লোকে এই রকম একটা কাহিনী রচনা করে।

কোন এক সময় সাতজন ডাকাত-ভাই ছিল। তারা জানতে পেল দূরে বহুদূরে পৃথিবীর একপ্রান্তে বাস করে সাতটি কন্যা, সাত বোন। তাদের সাতজনের মধ্যে বেশ ভাব। সাতজনেই সুন্দরী আর সরল। সাত ভাই ডাকাত ঠিক করল ওদের সাতজনকে ধরে নিয়ে এসে বিয়ে করবে। ওরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলো পৃথিবীর প্রান্তে। সুযোগের প্রতীক্ষায় ওত পেতে রইল। সন্ধ্যাবেলায় বোনেরা যখন বেড়াতে বের হল তখন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা এক বোনকে ধরতে পারল, বাকিরা পালিয়ে গেল।

ডাকাতেরা একটি কন্যাকে নিয়ে গেল, কিন্তু এর জন্য তাদের কঠিন শাস্তি পেতে হল। ঈশ্বর ওদের তারায় পরিণত করে দিলেন। সেই তারামণ্ডল, যাকে আমরা ঋক্ষমণ্ডল বলি। ঈশ্বর ওদের ধ্রুবতারা পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করলেন।

অন্ধকার রাতে আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে ভালুকের লেজের মধ্যতারার খুবই কাছাকাছি তোমরা দেখতে পাবে একরত্তি একটি তারা। এ হল সেই মেয়েটি যাকে ডাকাতেরা চুরি করেছিল।

আর কৃত্তিকা হল বাকি ছয়কন্যা। ভয়ে জড়সড় হয়ে ও ওকে চেপে ধরে আছে। রোজ রাতে ওরা দুরুদুরু বুকে আকাশে ওঠে ওদের সেই বোনটির খোঁজে।

আকাশের অন্য দিকে গুটি কয়েক ছোট ছোট তারা ছড়িয়ে পড়ে একটি অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করেছে, দেখে মনে হয় যেন আলো ঝলমলে ফুলের আধখানা মুকুট। এ হল উদীচী কিরীট নক্ষত্রপুঞ্জ।

গ্রীসের পুরাকাহিনীতে বলে যে কোন এক সময় আরিয়াড্‌নে নামে এক সাহসী সুন্দরী তরুণী বাস করত। সে ছিল ক্রিট দ্বীপের রাজার কন্যা। রাজকন্যা ভালোবেসেছিল থেসেউস নামে এক বীর যোদ্ধাকে। বাবা রুষ্ট হবেন জেনেও ভয় না পেয়ে মেয়ে সেই বীর যোদ্ধার সঙ্গে চলে গেল। কিন্তু পথে থেসেউস স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে সে দেখল তার ওপর দেবতাদের আদেশ হয়েছে যেন সে আরিয়াড্‌নেকে ছেড়ে দেয়। দেবতাদের আদেশ অমান্য করার সাহস থেসেউসের হল না। মনের দুঃখে সে আরিয়াড্‌নেকে সমুদ্রতীরে ছেড়ে দিয়ে একা এগিয়ে চলল। আরিয়াড্‌নে কাঁদতে লাগল।

আরিয়াড্‌নের কান্না শুনে দেবতা বাখুস ওকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন, দেবীতে পরিণত করে দিলেন। আর

আরিয়াড্‌নের সৌন্দর্যকে অমরত্বদানের জন্য তিনি ওর মাথা থেকে ফুলের মুকুটটা খুলে আকাশে ছুঁড়ে দিলেন।

মুকুটটা যতক্ষণ শূন্যে উড়ছিল সেই সময়ের মধ্যে মুকুটের ফুলগুলো মণিমুক্তায় পরিণত হয়ে গেল, আর আকাশে পেঁছে হয়ে গেল ঝলমলে তারার মালা। লোকে এই নক্ষত্রমুকুটের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করে সুন্দরী আরিয়াড্‌নেকে।

এবারে আরও একটি নক্ষত্রপুঞ্জ। আমাদের আঁকা ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখ। ইংরেজি 'এম্‌' অক্ষরের মতন দেখতে পাঁচটি ছোট ছোট তারার সমষ্টি, তার পাদুটি যেন দু'পাশে খসে পড়েছে। প্রাচীনকালের লোকেরা এটাকে আরাম কেদারায় অর্ধশায়িতা কোন কুমারীর মূর্তিরূপে কল্পনা করে। এই নক্ষত্রপুঞ্জের নাম 'কাশ্যপিয়া'। কাশ্যপিয়াকে ঘিরে আছে আরও তিনটি নক্ষত্রপুঞ্জ — সেফিউস, অ্যান্‌ড্রমিডা ও পার্সিয়ুস।

এই চারটি নক্ষত্রপুঞ্জকে নিয়ে প্রাচীন গ্রীকেরা অতি দীর্ঘ এক কাহিনী রচনা করে।

অনেক অনেক কাল আগে সেফিউস নামে এক রাজা আবিসিনিয়ায় রাজত্ব করতেন। তাঁর ছিল সুন্দরী স্ত্রী — কাশ্যপিয়া। কিন্তু তিনি সাগরের মায়াবিনী নেরেইডদের সামনে নিজের রূপের বড়াই করতে লাগলেন। নেরেইডরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সাগরের অধিপতি পসেইডনের কাছে নালিশ করল। পসেইডন দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে আবিসিনিয়ার তীরের দিকে এক প্রকাণ্ড ভয়ানক তিমি পাঠিয়ে দিলেন।

তিমিটার মন কী করে ভোলানো যায় যাতে হতভাগ্য দেশটাকে সে শান্তিতে থাকতে দেয়?

জ্ঞানীপুরুষেরা সেফিউসকে পরামর্শ দিলেন দেশের সবচেয়ে সুন্দরী তরুণীকে, তাঁর নিজের আদরের মেয়ে অ্যান্‌ড্রমিডাকে যেন তিনি তিমির হাতে সমর্পণ করেন।

রাজা কাঁদলেন। কিন্তু কী আর করা? ভয়ঙ্কর তিমিটার কবল থেকে যে কোন মূল্যেই হোক নিজের দেশকে উদ্ধার করা চাই। ঠিক করলেন মেয়েকে তিমির কাছে উৎসর্গ করবেন।

অ্যান্‌ড্রমিডাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে এসে শিকল দিয়ে একটা শৈলচূড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হল। তিমিটা সাঁতরে এসে ওকে নিয়ে যাবে।

এই সময় আবিসিনিয়া থেকে অনেক দূরে সাহসী যোদ্ধা পার্সিয়ুস অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ কীর্তিসাধনের জন্য তৈরি হচ্ছিল। সে এসে উপস্থিত হল এক নির্জন দ্বীপে। সেখানে ছিল গর্গনদের বাস। গর্গনরা ভয়ঙ্করী দানবী, তাদের
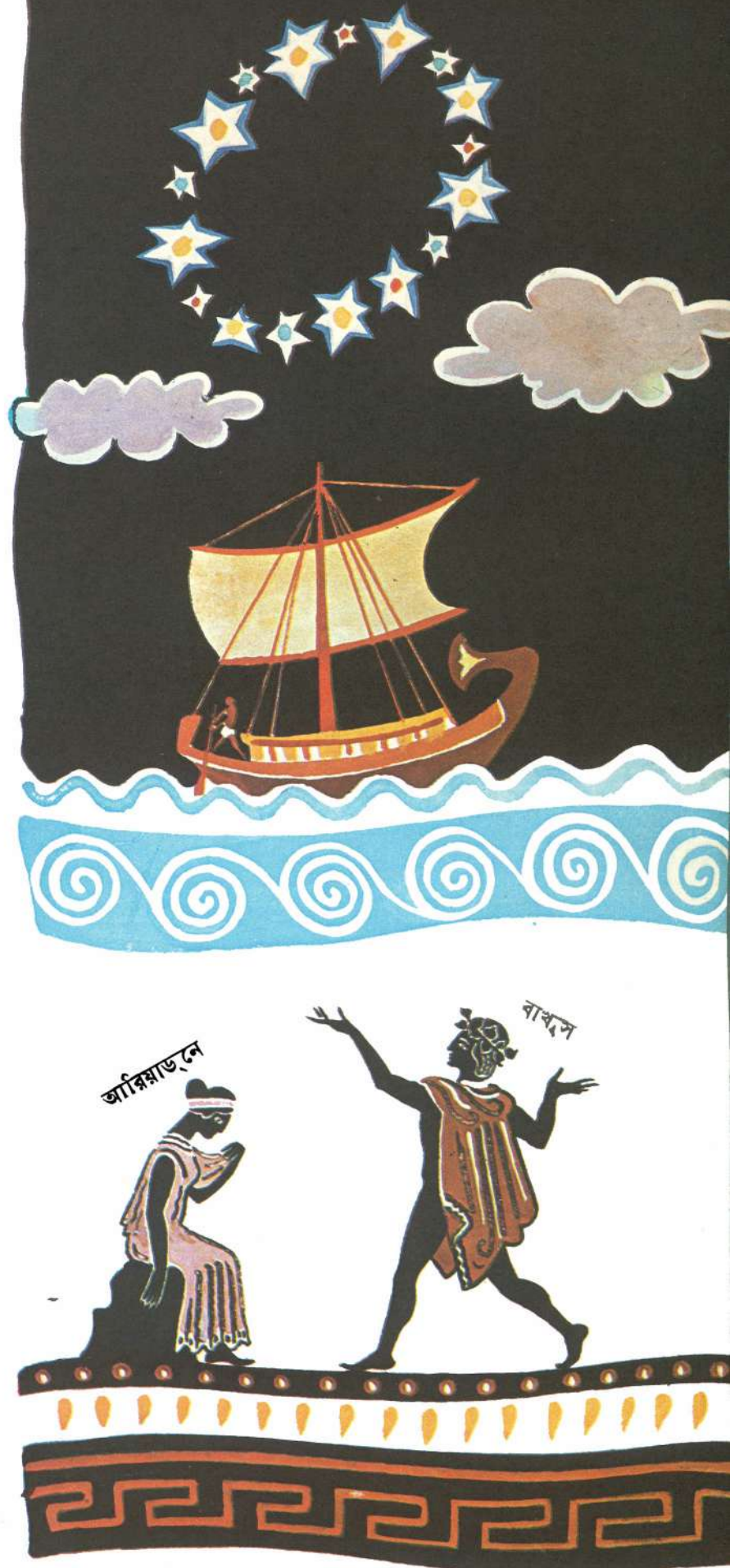
চেহারা খল নারীদের মতো। চুলের বদলে তাদের মাথায় কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ। লোকে তাদের দেখামাত্র ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পাথরের মূর্তি বনে যায়।

গর্গনরা যখন নিদ্রা যাচ্ছিল সেই সময় পার্সিয়ুস চুপিসারে তাদের রাজ্যে এলো। গর্গনদের মধ্যে প্রধান ছিল মেডুসা। পার্সিয়ুস তার মাথা কেটে ফেলল।

পার্সিয়ুস তার থলির ভেতরে মেডুসার ভয়ঙ্কর কাটা মাথাটা লুকিয়ে ফেলল, তারপর ডানা-লাগানো মন্ত্রপূত চটি পায়ে বাড়ির দিকে ছুটল।

আবিসিনিয়ার ওপর দিয়ে ওড়ার সময় পার্সিয়ুস দেখতে পেল সমুদ্রতীরে শৈলচূড়ার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় সুন্দরী অ্যান্‌ড্রমিডা কাঁদছে।

আর ঠিক সেই সময় ভয়ঙ্কর তিমিটাও তীরের দিকে চলে এসেছে। অ্যান্‌ড্রমিডাকে সে প্রায় ধরে-ধরে।

চিলের মতো ছোঁ মারার ভঙ্গিতে পার্সিয়ুস ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিমিটার ওপরে। তিমির সঙ্গে তার বহুক্ষণ লড়াই চলল। শেষে পার্সিয়ুস তাকে মেডুসার ভয়ঙ্কর মাথাটা দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পরাক্রান্ত দানব আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল।
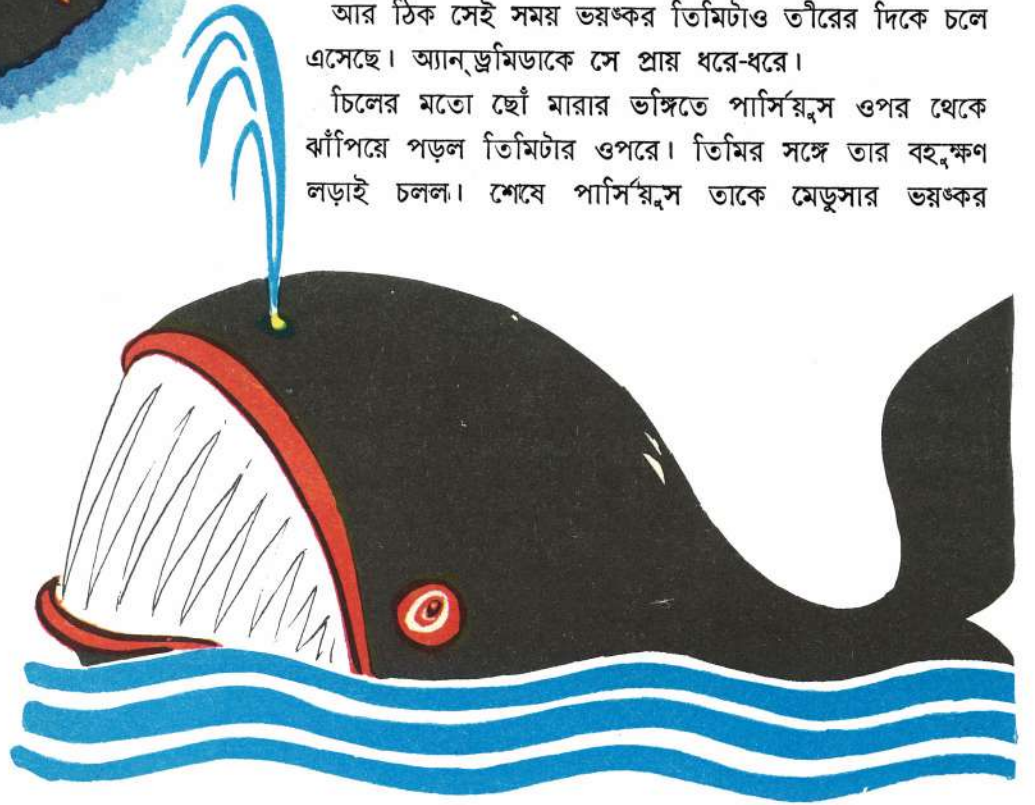
আবিসিনিয়ার উপকূলের কাছাকাছি একটা দ্বীপে পরিণত হল তিমিটা। আর পার্সিয়ুসও সুন্দরী অ্যান্‌ড্রমিডাকে বন্ধনমুক্ত করে নিয়ে গেল তার বাবার কাছে।

রাজা সেফিউস যার-পর-নাই আহ্লাদিত হলেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপে যশস্বী বীর পার্সিয়ুসের হাতে তাকে সমর্পণ করলেন, পার্সিয়ুসের সঙ্গে বিয়ে দিলেন তাকে।

আকাশে অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ, তাদের সম্পর্কে কাহিনীও অনেক। ঐ যে ক্রুশচিহ্নের আকারে ছড়িয়ে পড়েছে কতকগুলো তারা। এই নক্ষত্রপুঞ্জের নাম বকমণ্ডল। লোকে বলে স্বয়ং সর্বশক্তিমান দেবতা জেউস শ্বেতপক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে পৃথিবীর মানুষের কাছে উড়ে আসছেন।

আর ঐ যে অপূর্ব সুন্দর নক্ষত্রপুঞ্জ কালপুরুষ। কালপুরুষ হল পুরাকাহিনীর এক অসমসাহসী শিকারী। কোন এক প্রকাণ্ড জন্তুর গায়ে সে লগুড় ছুঁড়ে মারে।

বকমণ্ডল

আকাশের আরেক দিকে ঘাপটি মেরে আছে বৃশ্চিক। এই নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকালে মনে হয় যেন অন্ধকারের মধ্যে ঐ খলপ্রকৃতির পোকাটার দাঁড়াগুলো জ্বলজ্বল করছে।

নক্ষত্রখচিত আকাশ — অসংখ্য গল্পকথার এক মহাগ্রন্থ। গুনে শেষ করা যায় না সেই সব কাহিনী।

কিন্তু গল্প গল্পই। আমাদের এখনও জানতে বাকি আছে আসলে তারারা কী।

মানুষ এই নিয়ে বহুকাল অনেক ভাবনাচিন্তা করে।

অনেকের ধারণা হয়েছিল তারারা হল ছাদের গায়ে কতকগুলো ছোট ছোট ফুটো, যার ভেতর দিয়ে আলো প্রকাশ পায়।

আবার কেউ কেউ মনে করত ওগুলো আকাশের গায়ে গাঁথা সোনালি ও রুপোলি পেরেকের ছোট ছোট মাথা।

তবে সকলেই এই ব্যাপারে একমত ছিল যে আকাশ একটা গম্বুজাকৃতির কঠিন ছাদ। তার কারণ এই যে তারারা কখনও নিজেদের জায়গা ছেড়ে যায় না। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চলে যায়, কিন্তু কোন তারকাসমষ্টির, কোন নক্ষত্রপুঞ্জের এতটুকু পরিবর্তন দেখা যায় না। আর দেখেশুনে

বৃশ্চিক

মনে হয় কী দিয়ে যেন শক্ত করে আটকানো। যেন দেয়ালের গায়ে পেরেক গাঁথা।

আকাশের তারা যদি ফেঁসোর মতো শূন্যেই ভাসত তাহলে কোনমতেই যথাস্থানে টিকে থাকতে পারত না। নক্ষত্রপুঞ্জেরও আকারের পরিবর্তন ঘটত। আর নক্ষত্রপুঞ্জ যেহেতু এক জায়গায় শক্ত গাঁথা হয়ে আছে তার মানে আকাশ শক্ত। শক্তই যদি হয় তাহলে উড়ে আকাশের ঐ সীমানায় পেঁছানো যায়, তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়।

কিন্তু আসল মুশকিলটা হচ্ছে এখানেই যে সেকালের মানুষ উড়তেই জানত না; তাই আকাশ নামে ঐ ছাদটা আমাদের মাথার কতটা উঁচুতে আছে এবং সেটা কী রকম, তা বহুকাল তাদের পক্ষে যাচাই করে দেখাও সম্ভব হল না। লোকে জানতে পারল না ওটা কি পাথরের মতো শক্ত ও পুরু? নাকি স্ফটিকের মতো, অথবা কাচের মতো পাতলা, ঠুনকো? কেনই বা দিনের বেলায় তা নীল আর রাতের বেলায় কালো?

কালপুরুষ
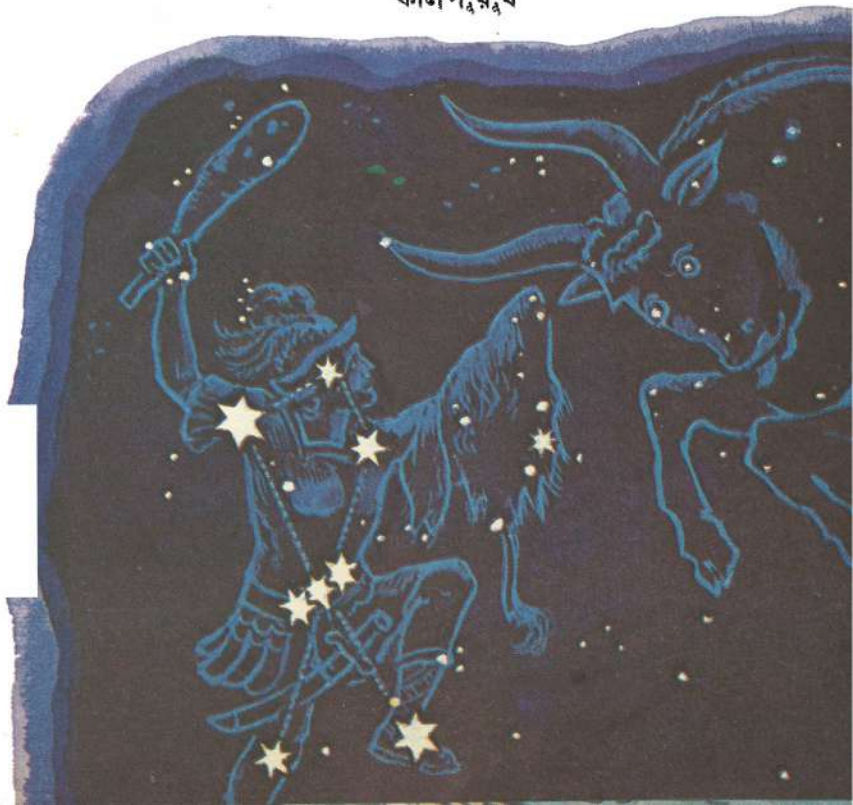
আকাশ কি ছেঁদা করা যায়?

এসো নীল আকাশকে ছেঁদা করার চেষ্টা করে দেখা যাক। রকেটে চেপে বসে সোজা ঊর্ধ্বপানে পাড়ি দিই!

রকেট গুঞ্জন শুরু করে দিল, তার আওয়াজ ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে শেষকালে কানফাটানো গর্জনে পরিণত হল; রকেট নড়েচড়ে উঠে স্বচ্ছন্দ গতিতে ঊর্ধ্বে যাত্রা করল।

জানলার বাইরে পৃথিবীটা নীচে নেমে যেতে লাগল।

দেয়ালের যন্ত্রের কাঁটা উচ্চতা মাপে।

...এক কিলোমিটার... ১·৫ কিলোমিটার...২ কিলোমিটার...

মনে হয় এখুনি বুঝি আমরা মেঘের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খাব। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু না, কোন আঘাতই আমরা পাই না। মেঘ নরম, যেন ধোঁয়া।

ওদিকে যন্ত্রের কাঁটা এসে ঠেকেছে ৩ কিলোমিটারে।

চারদিক থেকে মেঘ এসে আমাদের ঘিরে ধরল। কী সুন্দর এই মেঘের রাশি! ডিমের ফেটানো শ্বেতাংশের বিরাট বিরাট পাহাড় বা তুলোর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপের মতো।

মেঘের ফাঁক দিয়ে নীচের মাটিতে দেখা যাচ্ছে ঘরবাড়ি, গাছপালা। অত উঁচু থেকে দেখায় খেলনার মতো।

আরও ওপরে উঠতে থাকি। ১০ কিলোমিটার উচ্চতা। অনেক নীচে ফেলে এসেছি মেঘের স্তর। বাড়ির ওপর তলা থেকে রাস্তার পাশে স্তূপাকার তুষার যেমন দেখায় এখন মেঘগুলোকেও তেমনি দেখাচ্ছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মাটি দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এখন আর ততটা স্পষ্ট নয়, যেন কুয়াশায় ঢাকা। ঘরবাড়ি আর গাছপালা আলাদা করে চেনা যায় না, কেবল ছাই-ছাই রঙের ছোপ — বনজঙ্গল, মাঠ, সরোবর, শহর — সব একাকার।

আমাদের মাথার ওপরকার আকাশ হয়ে ওঠে পরিষ্কার ঝকঝকে। আকাশ এখন আর আসমানী নীল রঙের নয়, ঘন নীল।

এখন হয়ত 'ছাদের' নাগাল পেতেও আর দেরি নেই। রকেটের গতি কমিয়ে আনাই বোধহয় সমীচীন হবে, নইলে আমরা এমন জোর ধাক্কা খাব যে আর দেখতে হবে না!

এদিকে রকেট উড়ছে হু হু করে, দ্রুত, আরও দ্রুত। বুক রীতিমতো দুরুদুরু করছে।

আচ্ছা জানলা দিয়ে একবার দেখাই যাক না। হয়ত আমরা 'ছাদের' একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছি? আরে দেখ, দেখ! এ কী কাণ্ড! নীল আকাশ আমাদের কাছে এগিয়ে ত আসছেই না, কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে গলে যাচ্ছে, গলে গলে পড়ছে। নীলের জায়গায় আকাশ হচ্ছে গাঢ় বেগনী রঙের, ক্রমেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। উচ্চতা ৪০ কিলোমিটার!

আকাশ হচ্ছে প্রায় মিশকালো। যেন রাতের আকাশ।

এমনকি তারাও দেখা যাচ্ছে। ভর দুপুর, সূর্য পুরোদমে আলো দিচ্ছে, আর সূর্যের পাশেই কিনা তারা!

কী ঘটল? কোথায় গেল নীল আকাশ?

আমাদের মাথার ওপর নেই। আমাদের ডান দিকে নেই, বাঁ দিকেও নেই। তাহলে কি নীচে? নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি। মাটি ঠিক জায়গায়ই আছে। তার ওপরে মেঘ, যেন মেঝের ওপর তুলোর ছোট ছোট ডেলা। কিন্তু এই পৃথিবী, এই মেঘ—সবই ঘন নীল ধোঁয়ায় ঢাকা।

তাহলেই বোঝ কোথায় গেল সেই নীলাকাশ। নীলাকাশ আমাদের পায়ের নীচে! আমরা যখন ওপরে উঠছিলাম তখন

আমাদের আগোচরে কোন এক সময় তাকে বিঁধেছি, ফুঁড়ে চলে গেছি তার ভেতর দিয়ে, যেন একটা ফুটো ছাদের ভেতর দিয়ে; চলতে চলতে এসে পেঁছেছি 'নীল আকাশের ওপরে'!

দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর ঠিক কাছের নীল আকাশ যেন জলাভূমির ওপরে ভোরের কুয়াশার মতো। আর নীল আকাশটা যেমন ভাবা গিয়েছিল মোটেই তেমন পুরুও নয় — মাত্র তিরিশ কিলোমিটার খানেক। তাকে বিঁধানো আদৌ কঠিন নয়। তবে কিনা কোন ফুটোও থাকছে না। তা ধোঁয়া বা কুয়াশার মধ্যে ফুটো থাকেই বা কী করে?

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে আকাশ আছে দুটো — দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। একটা নীল, যেটা আমাদের কাছাকাছি, আরেকটা — কালো, ঐ আকাশের পেছনে, 'দ্বিতীয় সারিতে'।

অথচ আমরা কিনা ভেবেছিলাম একই 'ছাদ' দিনে আর রাতে রঙ বদলায়।

দেখা যাচ্ছে কালো 'ছাদটা' দিনের বেলায়ও কালো। সেটা দিন-রাত সব সময়ই নিজের জায়গায় আছে। তারাগুলোও তার গায়ে সর্বক্ষণ জ্বলে। কেবল দিনের বেলায় নীলাকাশ তাকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে।

তাহলে রাতের বেলা কোথায় যায় নীলাকাশ?

কোথাওই যায় না। কেবল রাতে হয়ে যায় স্বচ্ছ, অদৃশ্য।

নীল আকাশ হল বায়ু। এই সেই বায়ু যা তুমি আমি, আমরা সকলে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি, যাতে ডানা ভর দিয়ে পাখিরা ওড়ে, এরোপ্লেন ওড়ে।

বায়ু স্বচ্ছ, তবে একেবারে স্বচ্ছ নয়। তার ভেতরে বহু ধুলো আছে। যখন অন্ধকার হয় তখন ধুলো দেখা যায় না। রাতে আমরা ধুলো দেখতে পাই না, তাই আমাদের মনে হয় বাতাসই বুঝি নেই আমাদের মাথার ওপরে। কিন্তু দিনের বেলায় বাতাস সূর্যের আলোয় আলোকিত। কোন ধূলিকণা যখন বাতাসে ভেসে বেড়ায় তখন তার ওপর আলো পড়লে ঝলমল করতে থাকে একটা ছোট ফুলকির মতো। বাতাস হয়ে ওঠে ঘোলাটে।

একবার মনে করে দেখ, একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে সূর্যরশ্মি এসে পড়লে ধূলিকণায় বাতাস কী রকম ঘোলাটে দেখায়।

কিন্তু সে যাই হোক, আমাদের মাথার ওপর ঐ যে তারাভরা কালো আকাশ ওটা কী? ওটা অনেক দূরে কি?

পৃথিবী ছাড়িয়ে আরও দূরে আমরা উড়তে থাকি। অনেকক্ষণ ধরে চলি। উচ্চতা — ১০ হাজার কিলোমিটার। অথচ তারাগুলো এতটুকু কাছে এলো না। কিন্তু পৃথিবীটাকে
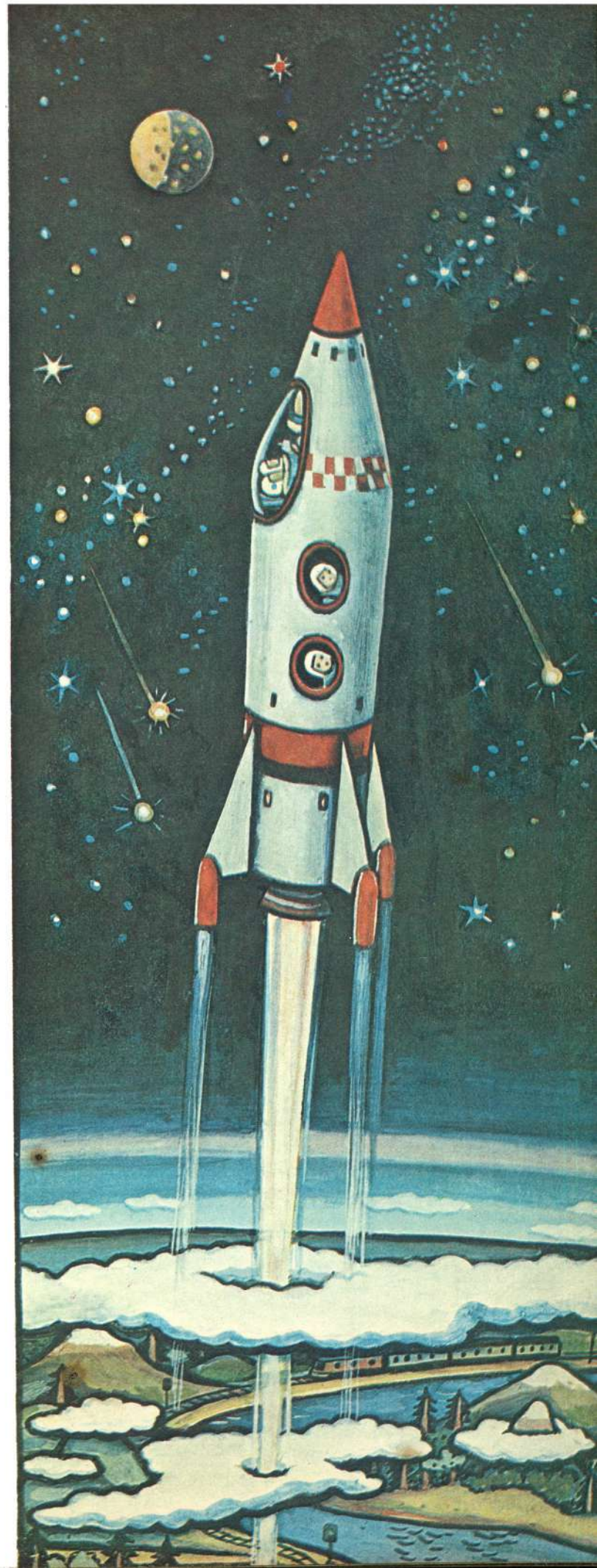
এখান থেকে দিব্যি ভালো দেখা যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভূমণ্ডলটা ঠিক যেন একটা সূক্ষ্ম নীল মসলিন কাপড়ে জড়ানো। তার সর্বাঙ্গ জুড়ে সূক্ষ্ম নীল আবরণের ঢল নেমেছে।

আমাদের এখন আর বুঝতে বাকি থাকে না এটা কী। এটা হল ঘোলাটে বাতাস।

এই আবরণটার ভেতরে, ঠিক পৃথিবীর বুকে যারা আছে তাদের কাছে এটা নীল আকাশ। এখন তারা ওখানে, 'চাঁদোয়ার' নীচে তারাদের দেখতে পায় না, কিন্তু আমরা দেখতে পাই।

বায়ুর আবরণ বাইরে থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। তবে পৃথিবী থেকে তিন হাজার কিলোমিটার দূরত্বে পর্যন্তও বায়ু আছে। অবশ্য সে বায়ুর স্তর একেবারেই হালকা।

আরও ওপরে?

আরও ওপরে বাতাস একদম নেই। সেখানে বিরাজ করছে শূন্যতা।

শূন্যতা বলতে কী বোঝায়? বায়ুর সঙ্গে শূন্যতার তফাত কোথায়?

আসলে তফাতটা বেশ বড় রকমের।

বাতাসে আমরা নিশ্বাস নিতে পারি। শূন্যতার মধ্যে নিশ্বাস নেওয়া সম্ভব নয়। শূন্যদেশে আমাদের নিরাপত্তায় পরতে হয় এক বিশেষ ধরনের রবারের পোশাক। কাঁধে-ঝোলানো সিলিণ্ডার থেকে ভেতরে বাতাস ছাড়তে হয়।

বাতাস ঠাণ্ডা হতে পারে, আবার গরমও হতে পারে। তাই বাতাসে অনেক সময় আমাদের ঠাণ্ডা লাগে, অনেক সময় গরম লাগে। কিন্তু শূন্যতায় সব সময় একই রকমের ঠাণ্ডা। সেখানে বেশ গরম করে শরীর জড়াতে হয়। হিমের সময় ধুনির সামনে যেমন লাগে শূন্যতায়ও অবস্থাটা হয় তেমনি। এক দিক থেকে সূর্য তোমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে আবার অন্যদিক থেকে তারাভরা কালো আকাশ তোমার ওপর 'ঠাণ্ডা নিশ্বাস' ছাড়ছে।

নিবাত নিষ্কম্প আবহাওয়ায় সামনে একটা পাখির পালক ছুঁড়ে দেখ — পালকটা উড়বে না, সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে পড়ে যাবে। বায়ুর বাধা থাকায় উড়তে পারে না। কিন্তু শূন্যতায় সে বাধা নেই। সেখানে আমাদের পালকটা অনেক অনেক দূরে চলে যাবে, যেন ওটা কোন ভারী লোহার জিনিস।

বাতাসে পাখিরা ওড়ে। শূন্যতায় তাদের হাঁটতে হত মাটিতে। ডানা সেখানে কোন কাজে লাগে না। সেখানে তাদের অবলম্বন করার মতো কিছু নেই। এরোপ্লেনও উড়তে পারে না শূন্যতার মধ্যে।

বায়ুর প্রলেপ লাগানো ভূমণ্ডলের চারপাশের এই শূন্যতাকে বলা হয় মহাশূন্য। সাধারণভাবে তাকে নিছক 'মহাকাশ' নামেও অভিহিত করা হয়।

এখন দেখা যাচ্ছে এই শূন্যতার মধ্যে আমরা যে কোন দিকে, যতদূরেই যাই না কেন, এক মাস, এক বছর, এমনকি হাজার বছর উড়লেও শূন্যতার শেষে, মহাকাশের শেষে, 'কালো ছাদটার' শেষে আমরা কস্মিনকালে পৌঁছাতে পারব না।

মহাকাশের বুকে পৃথিবী হল অকূল সমুদ্রে ভাসমান একটি দ্বীপের মতো।

মহাকাশে আরও 'দ্বীপ' আছে। পৃথিবী থেকে তাদের দেখা যায়। তারা হল চন্দ্র-সূর্য-তারা। এদের কাছে পৌঁছানো যায়। কিন্তু এদের পরেও আবার আছে সেই শূন্যতা।

শূন্যতার কোন শেষ নেই। 'কালো ছাদ' বলে আদৌ কিছু নেই — না পাথরের না স্ফটিকের।

এই কারণে ছেঁদা করা যায় কেবল নীলাকাশটা। সে কাজটা মোটে কঠিন নয়। এই নীলাকাশ আমাদের খুবই কাছে। আর তা 'কোমল' — ধোঁয়ার মতো, কুয়াশার মতো।

সূর্য আর চাঁদ কিসে তৈরি?

লোকে একেবারে হালে মহাকাশে ওড়া শুরু করেছে। মহাকাশে প্রথম যান ইউরি গাগারিন। ১৯৬১ সালে। তার পর থেকে বেশ কিছু সোভিয়েত ও মার্কিন মহাকাশচারী ওখানে গেছেন।

কিন্তু এরকম বিপদসঙ্কুল যাত্রায় মানুষকে পাঠানোর আগে মহাকাশ সম্পর্কে অন্তত কিছু জানা দরকার ছিল।

রাতের কালো আকাশ কী, চন্দ্র-সূর্য-তারা কী — মানুষ পৃথিবীতে বসে এসব কী করে জানতে পারল? কেননা আকাশের দিকে যতক্ষণ খুশি চেয়ে দেখ না কেন, এমনকি যদি সারারাত ধরেও চেয়ে দেখ তবু আকাশকে তোমার মনে হবে যেন একটা ছাউনি, সূর্য আর চাঁদ — জ্বলজ্বলে চ্যাপ্টা চাটু আর তারাগুলো — নিছক কতকগুলো উজ্জ্বল বিন্দু।

কী ভাবে ওদের আরও ভালো করে নিরীক্ষণ করা যায়?

কাগজের ওপর একটা কালির বিন্দু বসালে আতস কাচ দিয়ে সেটা নিরীক্ষণ করে দেখতে পার। কখনও চেষ্টা করে দেখেছ কি? অমনিতে, খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ নেহাৎ একটা ছোট্ট বিন্দু। কিন্তু আতস কাচের ভেতর দিয়ে দেখ — একটা বড় ধ্যাবড়া চাপাটির মতো। আর কাগজটা এখন আগেকার সেই মোলায়েম কাগজ নয়, এ যেন আগাগোড়া আঁশ-আঁশ একটা খসখসে পশমী কাপড়।

আতস কাচের ভেতর দিয়ে তোমার নিজের আঙুল একবার দেখ, মনে হয় যেন বিশাল, মোটা। আঙুলের প্রতিটি ভাঁজ আর রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু কাগজের ওপরে বিন্দু আর নিজের হাতের আঙুল — এসবই হল কাছের বস্তু। আতস কাচ তাদের সামনে আনা যায়। কিন্তু আকাশের কাছে নিয়ে যাবে কী করে?

তবে দেখা যাচ্ছে আকাশের জন্যও আতস কাচ আছে।

তোমরা কখনও বাইনোকুলার দিয়ে তাকিয়ে দেখেছ কি? সম্ভবত দেখেছ। বাইনোকুলার — এও কিন্তু এক ধরনের আতস কাচ, কেবল তফাত এই যে তাকে 'ঠিক আঙুলের সামনে' নিয়ে আসতে হয় না। বাইনোকুলার দিয়ে আমরা দূরের সমস্ত জিনিস নিরীক্ষণ করতে পারি।

বাইনোকুলার দিয়ে রাস্তার ওপাশে তাকিয়ে দেখ। সব যেন কাছে চলে এসেছে, অনেক বড় হয়ে উঠেছে। তাই না?

ছোট ছোট অপেরা গ্লাসে (বড় থিয়েটার-হল্-এ দূরের সারি থেকে দেখার জন্য এক ধরনের বাইনোকুলার) দেখার জিনিস মোটামুটি তিনগুণ কাছে চলে আসে। বড় বড় বাইনোকুলারে, যেমন, নাবিকদের কাছে যে বাইনোকুলার থাকে, তাতে আসে আটগুণখানেক কাছে। এ ধরনের বাইনোকুলার দিয়ে দেখলে চাঁদকে মনে হবে বিশাল, মনে হবে আমরা যেন চাঁদের আটগুণ কাছে এগিয়ে এসেছি। এমনকি চাঁদের গায়ের নানা ধরনের বহু ছোট ছোট এমন সব ছোপ চোখে পড়ে যেগুলো আমরা আগে কখনও দেখি নি।

আচ্ছা যদি আমরা একটা মস্তবড়, আলমারির সমান বিরাট একটা বাইনোকুলার তৈরি করি তাহলে কেমন হয়? ওরকম বাইনোকুলার দিয়ে চাঁদ হয়ত আরও কাছে দেখা যাবে? একেবারে নাকের ডগায়? হ্যাঁ তা ত বটেই।

এমনকি ডান চোখ আর বাঁ চোখের জন্য একজোড়া বাইনোকুলার করারও দরকার নেই। এক চোখেও আকাশ দেখা যায়।
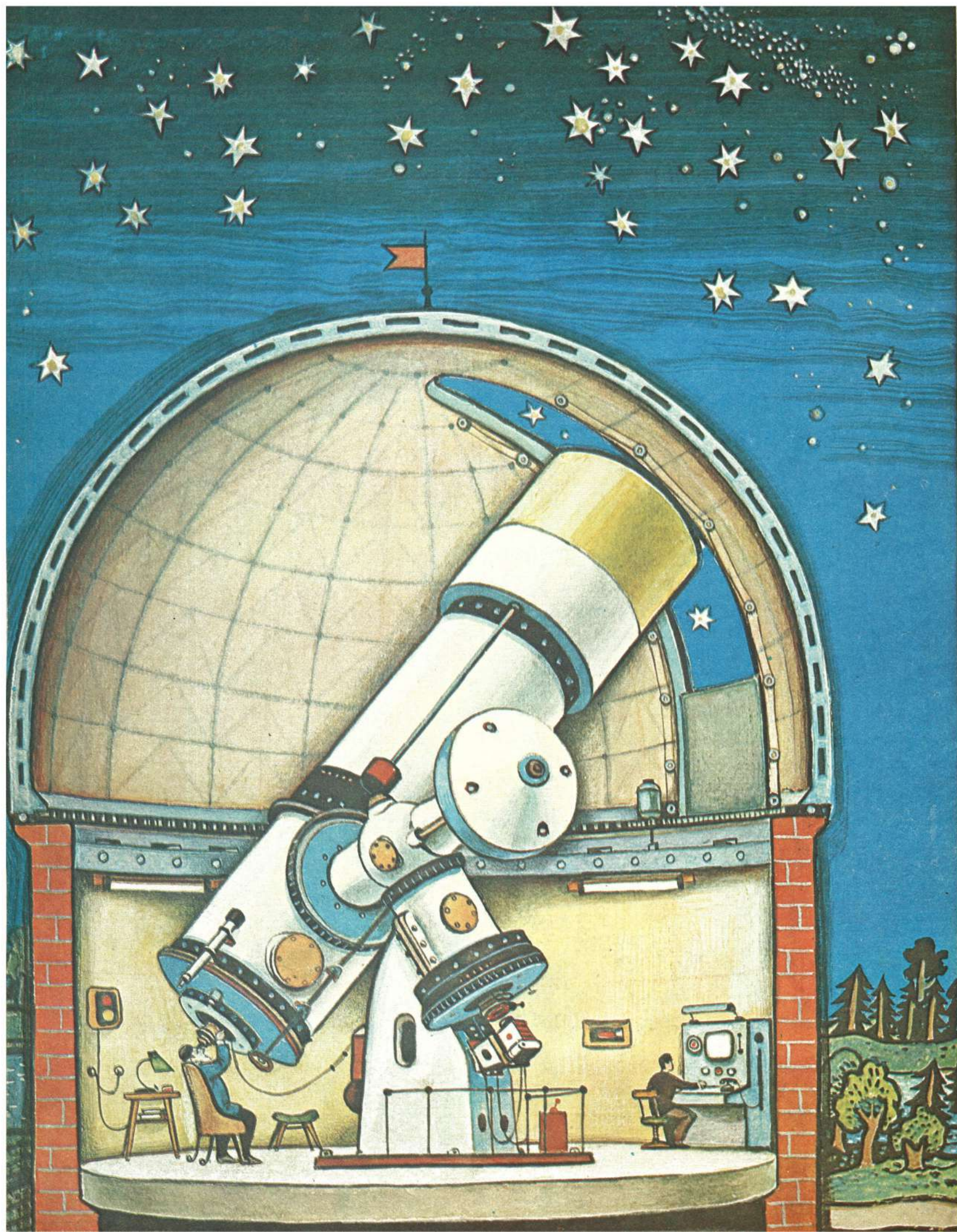
মানুষ তাই 'একচক্ষু বাইনোকুলার' তৈরি করল — এমনকি আলমারির সমান আকারের নয়, পুরোপুরি একটা বাস-এর সমান।

কাচ লাগানো এই বিশাল চোঙটার নাম দেওয়া হল টেলিস্কোপ।

এই যন্ত্রটা এত পেল্লায় যে বলাই বাহুল্য জনা বিশেক লোকেরও সাধ্য নয় তাকে হাতে ধরে তুলতে পারে। তাই একটা মস্তবড় মজবুত স্ট্যান্ডের ওপর তাকে রাখতে হয়। তাকে আর হাত দিয়ে এদিক ওদিক ঘোরানো যায় না, ঘোরাতে হয় ইলেকট্রিক মোটর আর বহু খাঁজ-কাটা চাকার সাহায্যে।

প্রতিটি টেলিস্কোপের জন্য তৈরি করতে হয় আলাদা আলাদা একেকটা পাকা দালান, গোলাকার বিরাট বুরুজ।

এ ধরনের বুরুজের ছাদ ইচ্ছেমতো নড়ানো যায়। আকাশ দেখার দরকার হলে ছাদটা টেনে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজ শেষ হওয়ার পর জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে ছাদটা আবার ঢেকে দিলেই হল, যাতে বৃষ্টি পড়ে টেলিস্কোপ ভিজে না যায়।

টেলিস্কোপ একটা জটিল ও দামী জিনিস।

কিন্তু তাহলেও যে-কোন জিনিসকে টেলিস্কোপ যে কী দারুণ বড় করে দেখায় তা যদি তোমরা জানতে! কয়েক শ', এমনকি হাজার গুণ বড় করে দেখায়! এ ধরনের টেলিস্কোপ দিয়ে এক কিলোমিটার দূর থেকে বই পড়া যায়! বইটাকে দেখে মনে হবে যেন এক পা দূরে আছে!

টেলিস্কোপ নামে পরিচিত এই রকম অপূর্ব চোঙের সাহায্যে লোকে গোটা আকাশটা বেশ করে দেখে নিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সূর্য, চাঁদ আর তারা দেখল।

পৃথিবীর চারধারে কী কী আছে সে বিষয়ে আকর্ষণীয় অনেক কিছু লোকে জানতে পারল।

টেলিস্কোপ মানুষকে আকর্ষণীয় অনেক বিবরণ দিল।

দেখা গেল সূর্য একটা বিশাল গোলক। চাঁদও তাই। আর তারারাও বিশাল বিশাল গোলক। তারাগুলোকে ছোট ছোট বিন্দুর মতো দেখায় একমাত্র এই কারণে যে ওরা আরও অনেক অনেক দূরে আছে।

বহু কিলোমিটার দূর থেকে রাস্তার একটা বড় বাতিকেও ত এইটুকু একটা বিন্দুর মতো দেখায়। তাই না?

মহাকাশে যে সমস্ত গোলক আছে তাদের সকলকে বলা হয় 'জ্যোতিষ্কমণ্ডলী'। তাদের একটার সঙ্গে আরেকটার অনেক তফাত।

যেমন ধরো সূর্য। সূর্য একটা আগুনের গোলা, স্রেফ আগুনের গোলা। তার ভেতরে শক্ত কিছুই নেই। সূর্যের সমান বড় কোন দৈত্য থাকলে সে অনায়াসে ধুনির আগুনের গোলার মতো সূর্যকে একটা কাঠি দিয়ে ফুঁড়তে পারত। তাতে কাঠিটা সঙ্গে সঙ্গে দপ করে জ্বলে পুড়ে যেত। সূর্যের কিছুই হত না।

তারাদের সঙ্গে আমাদের সূর্যের বেশ মিল আছে। ওরাও আগুনের তৈরি। সূর্যের মতো ওরাও আগুনের গোলা। তাদের মধ্যে অনেকে আবার সূর্যের চেয়েও বড়।

আসল কথা হল সূর্য আমাদের অনেক কাছে। তাই তাকে বড় মনে হয়। এই কারণেই সূর্য উজ্জ্বল আলো দেয়, আর প্রচণ্ড তাপ বিকিরণ করে। আর তারারা সূর্যের তুলনায় আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। এই কারণেই তাদের আলো ক্ষীণ, আর উত্তাপও এতটুকু নেই।

চাঁদও গোলক। তবে চাঁদ পাথুরে গোলক, কঠিন, ঠাণ্ডা। পৃথিবীর মতো চাঁদ নিজে আলো দেয় না। ঠাণ্ডা পাথর কি আর বাতি হতে পারে? আকাশে চাঁদকে দেখা যায় একমাত্র এই কারণে যে সূর্য তাকে আলোকিত করে। সূর্যের আলো নিভিয়ে দাও, চাঁদও নিভে যাবে।

একটা কাগজের টুকরোর ওপর চাঁদ, পৃথিবী আর সূর্যকে পাশাপাশি আঁকা যাক। চাঁদ আর পৃথিবীর জায়গা হবে, কিন্তু সূর্যের হবে না। তাকে আঁকতে হব আলমারির সমান করে। তাহলে বুঝতেই পারছ পৃথিবী আর চাঁদের তুলনায় সূর্য কত বড়।

মহাকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পরস্পরের কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। আমাদের বিপুল ভূমণ্ডলকে যদি একটা ছোট্ট কুলের আকারে কল্পনা করা যায়, তাহলে তার তুলনায় মটর দানার সমান আকারের চাঁদকে রাখতে হয় আধ মিটার দূরে; আর সেক্ষেত্রে আলমারির সমান আকারের সূর্যকে রাখতে হবে পৃথিবী থেকে ২০০ মিটার দূরে।
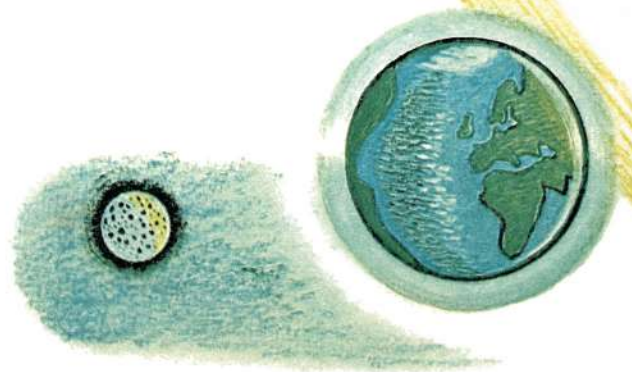
আর সূর্যের মতোই আলমারিসমান আকারের সবচেয়ে কাছের তারাটির অবস্থানস্থল হবে মহাসাগরের অপর পাড়ে, আমেরিকায় বা অস্ট্রেলিয়ায়, ঐ রকম কোথাও।

তাহলেই দেখতে পাচ্ছ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কী বিরাট!

আমাদের সবচেয়ে কাছে আছে চাঁদ। কিন্তু চাঁদে পেঁছতে 'তু-১৫৪'-র মতো শক্তিশালী জেট প্লেনেরও লেগে যাবে দু'সপ্তাহ, তাও আবার অবিরাম গতিতে চললে।

লেনিনগ্রাদের মতো একটা শহরের কথাই মনে মনে কল্পনা কর না কেন। এই এত বড় শহরটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হেঁটে পার হতে গেলে অবিরাম গতিতে চলতে হবে ঘণ্টা পাঁচেক। রাজপথের ওপর দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চললে পার হতে সময় লাগে পনেরো মিনিট। আর 'তু-১৫৪' জেট প্লেন আকাশপথে ঐ দূরত্ব পার হবে দেড় মিনিটে। একবার ভেবে দেখ কত দ্রুত ওড়ে!

ঐরকম গতিবেগেও কিনা চাঁদে পেঁছতে লেগে যাবে দু'-সপ্তাহ! দেড় মিনিট কাটতেই পুরো শহরটা পড়ে রইল পেছনে। এক ঘণ্টা কাটতে আমরা পেরিয়ে গেলাম চল্লিশটা লেনিনগ্রাদ। চব্বিশ ঘণ্টায় এক হাজার লেনিনগাদ!

আর অমন দানবীয় পদক্ষেপে কিনা দু'সপ্তাহ!

চাঁদ বেশ দূরে! তাহলেও আর সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তুলনায় অনেক কাছে। এই কারণেই তাকে বলা হয় পৃথিবীর উপগ্রহ।

বাকি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বহুগুণ দূরে অবস্থান করছে।

এরোপ্লেনে চেপে সূর্যে যাওয়া সম্ভব হলে সময় লাগত ১৫ বছর! তার মানে প্লেনে যখন তোমরা চাপলে তখন স্কুলের ছাত্র, আর প্লেন থেকে যখন নামলে তখন ইয়া দাড়িওয়ালা, দাদা-খুড়োর বয়সী।

আর তারারা যেখানে আছে সেখানে ঐ গতিবেগে পেঁছতেই পারবে না। পথের একেবারে শুরুতেই, খানিক দূর যেতে না যেতে বুড়িয়ে যাবে।

কী বিপুল এই মহাকাশ!

অথচ দেখ, পুরোটাই বেমালুম ফাঁকা, একটা 'শূন্যগর্ভ শূন্যতা'!

কী করে এই শূন্যতার মধ্যে সূর্য ঝুলছে? চাঁদ কেন পড়ে না? পৃথিবীরই বা অবলম্বন কী?
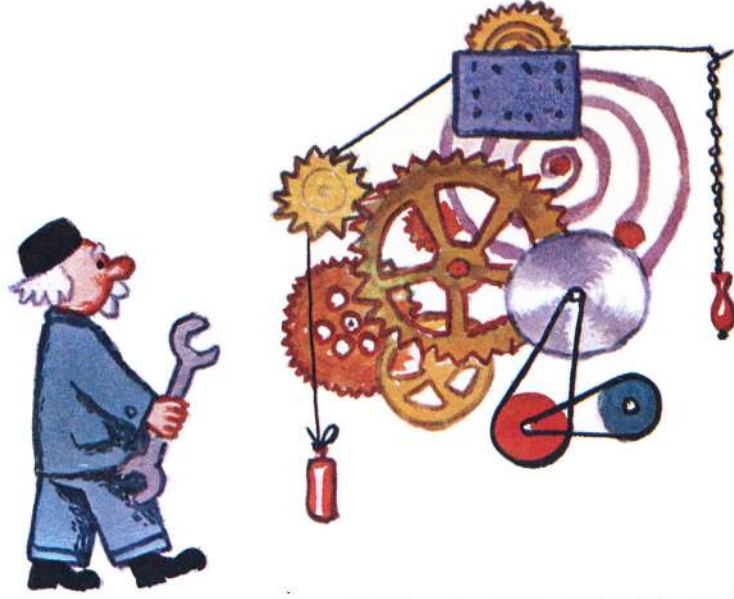
মহাকাশের বস্তুপুঞ্জের অবলম্বন কী?

একটা বল্ হাতে তুলে হাতের মুঠি ছেড়ে দাও। বল্‌টা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে এসে পড়বে। বাতাসে ত আর ঝুলে থাকতে পারে না, তাই না? কোন না কোন অবলম্বন তার থাকা দরকার। হয় মেঝেতে পড়ে থাকবে, নয় জলে ভাসবে, নয়ত সুতোয় ঝুলবে।

পৃথিবীতে সব কিছুই কিছু না কিছু অবলম্বন করে থাকে। যদি অবলম্বনের কিছু না থাকে তাহলে নীচে পড়ে যায়।

তোমরা বলবে, সত্যি নয়। গ্যাস-বেলুন অথবা হালকা ফেঁসো ত মাটিতে নাও পড়তে পারে? ঠিক কথা। শুধু তা-ই নয়, তারা ওপরেও উঠতে পারে। কিন্তু তার একমাত্র কারণ এই যে গ্যাস-বেলুন ও ফেঁসো বাতাসে ভর দিয়ে থাকতে পারে। তারা এতই হালকা যে বাতাসে ভাসে, যেমন কাঠের টুকরো একপাত্র জলে ভাসতে পারে। পাত্র থেকে জল ফেলেই দেখ না, কাঠের টুকরোটাও সঙ্গে সঙ্গে তলায় এসে ঠেকবে। বাতাসের ক্ষেত্রেও তাই। পৃথিবী থেকে সমস্ত বাতাস যদি সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হত তাহলে যে সমস্ত বস্তু বাতাসে ভাসে সেগুলো সব এসে ঠেকত বায়ুসমুদ্রের তলদেশে, সোজা ভাষায়, পৃথিবীর বুকে। গ্যাস-বেলুন, ফেঁসো সবই নীচে এসে পড়ত। পাখিরা উড়তে পারত না, এরোপ্লেনও পারত না। এর কারণ তারাও বাতাসে ভর করে আছে।

ভর দেওয়ার মতো কিছু না থাকলে পৃথিবীর যে কোন জিনিস নীচে পড়ে যায়।

কিন্তু মহাকাশে কোন অবলম্বন নেই। মহাকাশ শূন্য। ভূমণ্ডল সেখানে শায়িত থাকতে পারে না, ভেসে বেড়াতেও পারে না।

কী করে আমাদের পৃথিবীর মতো, চন্দ্র-সূর্য-তারার মতো এত বিশাল ভারী জিনিস কোন কিছুকে অবলম্বন না করে শূন্যে থাকতে পারে?

ভূমণ্ডল পড়ে না কেন?

পড়ে না? কে তোমাদের একথা বলল?

আসল কথা ত এখানেই! পৃথিবী আমাদের নিয়ে সর্বক্ষণ পড়ছে, উড়ছে, উড়তে উড়তে গিয়ে নেমে যাচ্ছে একটা অতল খাদের ভেতরে।

কিন্তু এ কী রকম কথা? কোথাও পড়ে যাচ্ছে এমন একটা গোলকের ওপর বসে থাকা ত ভয়ের কথা। পড়ে যাওয়া মানেই শেষ পর্যন্ত কিছু একটার গায়ে আছাড় খাওয়া।

পৃথিবী তাহলে কোথায় পড়ে? কোথায় গিয়ে তার আছড়ে পড়ার কথা?

এসো ভেবে দেখা যাক, মোটের ওপর সব জিনিস কোথায় গিয়ে পড়ে।

কোথায় আবার? নীচে! আর নীচ কোথায়?

এ আবার কী অদ্ভুত প্রশ্ন! নীচ, মানে নীচে।

আচ্ছা এসো দেখি, গোটা পৃথিবীটাকে একবার এ‌ঁকে দেখা যাক। পৃথিবী কি গোলক? হ্যাঁ, গোলক। এই গোলকটার ওপর সর্বত্র লোকজনের বাস? তা বৈ কি।

এখন আমরাও সব দিক থেকে ভূমণ্ডলের ওপর আঁকলাম চারটি ছেলে। ওদের চারজনের প্রত্যেকেরই বল্ পৃথিবীর বুকে এসে পড়বে। ওরা চারজনই বলবে যে ওদের বল্ নীচে পড়েছে। কেবল একটা ছেলের বল্ 'নীচে' পড়ার সময়, আমাদের ছবি অনুযায়ী, বাস্তবিকই নীচে এসে পড়েছে। দ্বিতীয় ছেলেটির বল্ আমাদের ছবির পৃষ্ঠায় উড়ে গিয়ে পড়েছে ডান দিকে। তৃতীয় জনের — বাঁ দিকে, আর চতুর্থ জনের নীচে ত পড়েই নি, উঠে গেছে ওপরে।

আবার পৃষ্ঠাটাকে উলটে দিলে চতুর্থ জনের বল্ পড়বে নীচে, আর প্রথম জনের উড়ে যাবে ওপরে।

তার মানে 'নীচ' হতে পারে নীচ থেকে, পাশ থেকে, ওপর থেকে — যেখানে খুশি।

'নীচ' অর্থ পৃথিবী, ভূমণ্ডল।

চুম্বক যেমন লোহার পেরেক আকর্ষণ করে ভূমণ্ডলও তেমনি চারপাশের সমস্ত কিছু আকর্ষণ করে নিজের দিকে।

সত্যি বলতে গেলে কি কেবল ভূমণ্ডলই যে এমন লোলুপস্বভাবের তা বলা যায় না। বস্তুমাত্রেই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু তাদের শক্তি বড়ই কম।

আলমারি সোফাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সে আকর্ষণ এতই ক্ষীণ যে কস্মিনকালে সোফাকে স্থানচ্যুত করা তার সাধ্য হবে না। এমন কি একটা বল্‌কেও নড়ানোর সামর্থ্য তার নেই।

বাড়ি আকর্ষণ করে আলমারিকে। কিন্তু তারও ক্ষমতা নেই আলমারিকে স্থানচ্যুত করে। পাহাড় আকর্ষণ করে বাড়িকে। কিন্তু পাহাড়েরও ক্ষমতা নেই বাড়িকে একচুল নড়ায়।

কিন্তু ভূমণ্ডলের আকর্ষণশক্তি এদের সকলের চেয়ে বেশি, এদের সকলকে সে এত জোরে আকর্ষণ করে যে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ না করে পারা যায় না। ভূমণ্ডল আলমারিকে এত জোরে টেনে ধরে রেখেছে যে আলমারি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানোর চেষ্টা করেই দেখ না কেন! তোমরা বলবে ভারী — তাই ত? আর 'ভারী' — এর অর্থই হল 'পৃথিবী জোরে টেনে রেখেছে'।

হঠাৎ যদি ভূমণ্ডল তার ওপরকার সমস্ত বস্তুর ওপর নিজের টান ছেড়ে দেয় তাহলে আলমারি মেঝে থেকে ওপরে উঠতে থাকত, ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াত, যেমন অ্যাকোয়ারিয়মের মধ্যে ভেসে বেড়ায় মাছের খাবারের কুচি। আর সেক্ষেত্রে আলমারি ভারি না হয়ে হত গ্যাস-বেলুনের মতো হালকা।

এই ভাবে বস্তুমাত্রেই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু টানাটানির খেলায় যার শক্তি বেশি, যে বেশি বড় তারই জিত হয়। আর যে ছোট, তুলনায় দুর্বল সে উড়ে আসে শক্তিমানের দিকে, বড়র দিকে, তার ওপর এসে পড়ে।

এই কারণে ছোট সর্বদা বড়র ওপর পড়ে।

এবারে ফিরে আসা যাক সেই প্রশ্নে — মহাকাশে পৃথিবী নিজে কোথায় পড়ছে?

চাঁদের ওপরে? না, চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে ছোট। তারার ওপরে? তারারা বড় বেশি দূরে। সূর্যের ওপরে? হ্যাঁ, তাছাড়া কী? ছোট সব সময় বড়র ওপর পড়ে। আমাদের বিশাল পৃথিবী সূর্যের তুলনায় একদম ছোট।

এই কারণে পৃথিবী সূর্যের ওপর পড়ছে।

কিন্তু এ যে ভয়ানক ব্যাপার! সূর্য হল একটা অগ্নিপিণ্ড। এর অর্থ, আমাদের পৃথিবী শিগগিরই সূর্যের গায়ে আছড়ে পড়বে, আগুনের সমুদ্রে ডুবে যাবে? আমরা চুল্লির মধ্যে পুড়ে মরব? ভয় পেয়ো না। পড়া মানেই কিছুর গায়ে আছড়ে পড়া নয়। পাশ কাটিয়েও পড়া যায়।

খুঁটির মাথায় ঘুরন্ত চক্রের সঙ্গে বাঁধা দড়ি ধরে দৌড়ানোর এক রকম খেলা আছে। খেলেছ কি? যদি খেলে থাক তাহলে নিশ্চয়ই জান যে খুঁটি থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে স্রেফ যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'পা গুটাতে যাও তাহলে কী হবে? ছিটকে গিয়ে সোজা পড়বে খুঁটির গায়ে, যেন খুঁটি তোমাকে টানছে। কিন্তু প্রথমে যদি ছুটে একপাশে সরে গিয়ে তারপর দু'পা গুটাও? তাহলে খুঁটির পাশ কাটিয়ে উড়ে যাবে।

ঐ রকম ভাবে যদি বন্ বন্ করে ঘুরতে থাক তোমার কেবলই মনে হতে থাকবে যেন খুঁটিটা তোমাকে তার দিকে টানছে। এই কারণে তোমার ওড়াটা সরল রেখায় হয় না, তুমি বারবার খুঁটির দিকে বাঁক নাও, তার দিকে এসে পড়। কিন্তু যেহেতু দ্রুত উড়তে থাক, তাই বাঁকটা আকস্মিক না হয়ে গড়ানে হয়।
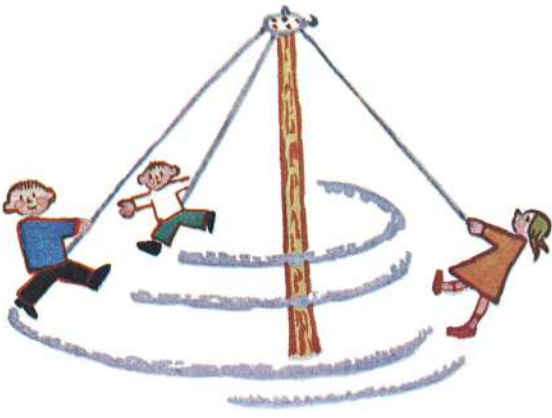
সেই কারণেই কখনও খুঁটির গায়ে গিয়ে পড় না, তার পাশ কাটিয়ে উড়ে যাও, তাকে প্রদক্ষিণ করে তার চারপাশে ঘুরতে থাক।

মহাকাশেও অনেকটা এই রকম ঘটে। সূর্য হল খুঁটি, আর পৃথিবী — তোমরা। পৃথিবী যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে সোজা পড়তে থাকত সূর্যের দিকে।

কিন্তু আসল ঘটনা এখানেই যে পৃথিবী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। পৃথিবী এক পাশে ছুটে যায় ঠিক যেন গতিবেগ অর্জনের উদ্দেশ্যে, যাতে সূর্যের পাশ কাটিয়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়া যায়। সূর্য তাকে নিজের দিকে টানে। পৃথিবীও সূর্যের দিকে ঘোরে। কিন্তু ঘোরে আস্তে আস্তে গড়ানে ভঙ্গিতে, যেহেতু ওড়ে খুব দ্রুত। এই কারণেই সূর্যের কাছাকাছি আসে না, স্রেফ তাকে প্রদক্ষিণ করে তার চারপাশ দিয়ে ঘুরে যায়। ঠিক ঐ খুঁটির চারপাশে দড়ি ধরে ঘোরার মতো। কেবল মাঝে মাঝে তোমাকে দু'পায়ে নীচের জমিতে ঠেলা মারতে হবে যাতে গতি থেমে না যায়। তার কারণ এই যে খুঁটির ওপরকার চাকাটা ভালোমতো ঘোরে না, ঘষটা খায়। মুখে বাতাসের ঝাপটা লাগে, তোমাকে থামিয়ে দেয়। কিন্তু মহাকাশে পৃথিবীর গতি রুদ্ধ করার মতো কিছু নেই। সেখানে প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহ নেই, চাকায় বাঁধা দড়ি নেই, নেই খরখরে পথ। মোটকথা, কিছুই নেই সেখানে। কোন এক কালে পৃথিবী ছিটকে এক পাশে সরে যায় — এর বেশি আর কিছু দরকার হয় না। তার পর থেকে আজ কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবী সূর্যের চারধারে ঘুরছে ত ঘুরছেই, থামতে আর পারে না।

ঐ একই ভাবে চাঁদও ঘুরছে মহাকাশে। তবে সে সূর্যের চারধারে ঘুরছে না, ঘুরছে পৃথিবীর চারধারে। পৃথিবী চাঁদের চেয়ে অনেক বড়। তাই চাঁদও পড়ছে তার চেয়ে বড় আমাদের এই পৃথিবীর দিকে, কিন্তু পড়তে পড়তেও পড়ছে না, কেবলই তার পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। কারণ এই যে চাঁদও দ্রুত এক পাশে ছুটে চলে যায়, তাই তার পক্ষেও আকস্মিক বাঁক নেওয়া কঠিন।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে মহাকাশে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা কারোরই কোন অবলম্বন নেই, সবই কোথাও না কোথাও পড়তে যাচ্ছে, কিন্তু পড়ছে পাশ কাটিয়ে। আর এইকারণে তারা সবাই ঘুরছে, ঘুরছে ত ঘুরছেই। চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারধারে। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারধারে।

কিন্তু পৃথিবী ও চাঁদের মতো সূর্যও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। সূর্য তারাদের মাঝখান দিয়ে অতল গহ্বরের মধ্যে কোথাও গিয়ে পড়তে যাচ্ছে। এদিকে তারারা নিজেরাও ভাসছে শূন্যতার মধ্যে।

না, মহাকাশে এমন কোন জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নেই, যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই কোথাও না কোথাও ছুটছে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে মহাকাশে জায়গার কোন অভাব নেই।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! —আকাশের দিকে তাকালে মনেই হবে না যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উড়ছে। চাঁদের কথাই ধর না কেন। তাকে দেখলে মনে হবে যেন আকাশের গায়ে সাঁটা। এরকম মনে হওয়ার কারণ এই যে চাঁদ আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে।

তোমরা কখনও লক্ষ করে দেখেছ কি কোন জাহাজ যখন আমাদের কাছ থেকে দূরে, দিগন্ত রেখার গায়ে, তখন সমুদ্রের বুকে সেটা কেমন গুটি গুটি এগিয়ে আসতে থাকে? অথচ জাহাজ কিন্তু তখন ঢেউ ভেঙে প্রচণ্ড বেগে ছুটছে, এত বেগে যে তার সঙ্গে ছুটে তুমি পাল্লা দিতে পারবে না। আবার দূর আকাশের গায়ে কোন এরোপ্লেনকে যখন একটা ছোট্ট বিন্দুর মতো দেখায় তখন তার গতি কী মন্থর বলেই না মনে হয়!

আকাশে চাঁদ উড়ছে এরোপ্লেনের চারগুণ বেগে। ধারণা করতে পার, আমরা যদি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কী প্রচণ্ড বেগে সে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেত? অথচ দূর থেকে দেখলে মনে হয় কষ্টেসৃষ্টে গুঁড়ি মেরে চলেছে। এটা লক্ষ করা যায় কেবল তার প্রতিবেশী ছোট ছোট তারাদের দিয়ে।

চাঁদের তুলনায় তারারা আমাদের চেয়ে বহু গুণ বেশি দূরে। এই কারণে তাদের একেবারে স্থির মনে হয়, যদিও আসলে কিন্তু চাঁদের চেয়ে তারা অনেক বেশি দ্রুত গতিতে ওড়ে।
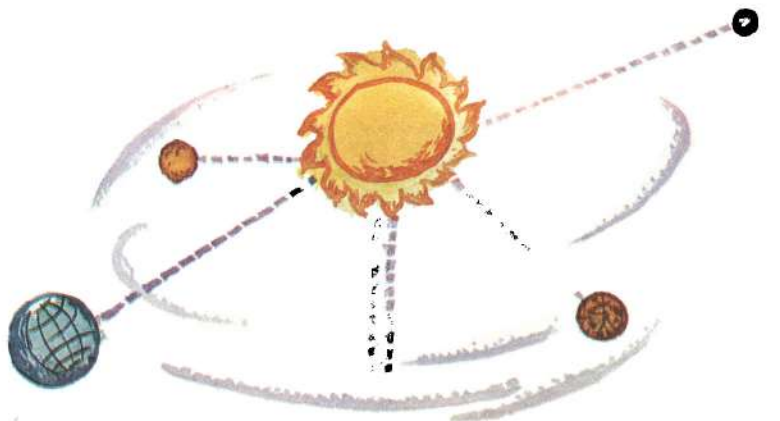
সূর্য কেন উদয় হয়, কেনই বা অস্ত যায়?

তোমাদের কী মনে হয়? — সূর্য ছাড়া আমরা বাঁচতে পারতাম কি? অবশ্যই না।

সূর্য পৃথিবীকে আলো দেয়, উত্তাপ দেয়। সূর্যের উত্তাপ ছাড়া উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না, গাছপালা পল্লবিত হয় না, মাঠ শ্যামল হয় না। পশুপাখি, পোকামাকড় সকলেই সূর্যের কিরণে আনন্দিত হয়ে ওঠে। আর আমি তুমি — আমরা, মানুষেরা যে আনন্দিত হব তাতে ত কোন সন্দেহই নেই।

সূর্য ছাড়া অন্ধকার, ঠাণ্ডা, বিশ্রী। সমস্ত প্রাণিকুল চেষ্টা করে রাতের বেলায় লুকিয়ে থাকতে, ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা ও অন্ধকারটা কাটিয়ে দিতে। আবার যখন সূর্য ওঠে তখন সমস্ত প্রকৃতি জেগে ওঠে, সজীবতা লাভ করে।

সূর্য হল পৃথিবীতে জীবনের উৎস। সূর্য সকলের দরকার। এই জন্য স্মরণাতীত কাল থেকে লোকে সূর্যের উপাসনা করত, উত্তাপের জন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানাত, প্রতিদিন প্রভাতে তার উদয়কে স্বাগত জানাত।

প্রাচীন গ্রীকেরা সূর্যকে নিয়ে কী সুন্দর কাহিনী রচনা করেছে দেখ।

মৃদুমন্দ বায়ু বইছে। পুব আকাশের রক্তিমাভা ক্রমেই আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে ঊষাদেবী এওস, তাঁর গোলাপী আঙুলের স্পর্শে অবারিত করে দিলেন প্রবেশদ্বার; তার ভেতর দিয়ে অচিরেই নিষ্ক্রান্ত হবেন ভাস্বর সূর্যদেব হেলিওস।

গোলাপী আলোর বন্যায় মৃদু উদ্‌ভাসিত আকাশে উজ্জ্বল গৈরিক পোশাকে সজ্জিত ঊষাদেবী গোলাপী ডানায় ভর করে উড়লেন। দেবী সোনার পাত্র থেকে ধরণীর বুকে শিশির ঢালেন। হীরা-ঝলমল বিন্দু বিন্দু শিশির এসে পড়ে ঘাস আর ফুলের ওপরে। সমস্ত ধরণী সুবাসে পরিপূরিত। জাগ্রত ধরণী সানন্দে স্বাগত জানায় উদীয়মান সূর্যদেব হেলিওসকে।

চার-পক্ষিরাজ ঘোড়ায় টানা, দেবতা হেফেস্টাসের তৈরি সোনার রথে চড়ে ভাস্বর সূর্যদেব সাগরতীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন আকাশের বুকে। পাহাড়-পর্বতের শীর্ষদেশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল উদীয়মান সূর্যের আলোকরশ্মিতে। সূর্যদেবকে দেখে তারারা দিকচক্রবাল থেকে পালাতে থাকে। একের পর এক গিয়ে মুখ লুকোয় কালো রাত্রির বুকে।

হেলিওসের রথ ক্রমেই ওপরে উঠতে থাকে। সূর্যদেবের মাথায় দীপ্ত মুকুট, অঙ্গে লম্বা ঝলমলে পোশাক। আকাশপথে চলতে চলতে তিনি ধরণীর ওপর ঢালেন সঞ্জীবনী আলোকরশ্মি, ধরণীকে দান করেন আলোক, উত্তাপ আর জীবন।

দিনের পথযাত্রা সমাপনান্তে সূর্যদেব নামেন মহাসাগরের পূত সলিলে। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে সোনার তরী। সেই তরীতে চেপে তিনি ফিরে চলে যান পুবে, সূর্যের দেশে, যেখানে আছে তাঁর অপরূপ প্রাসাদ। সূর্যদেব সেখানে রাতে বিশ্রাম করেন, পরদিন প্রভাতে আবার উদয় হন তাঁর পূর্ব দীপ্তি ও গৌরব নিয়ে।
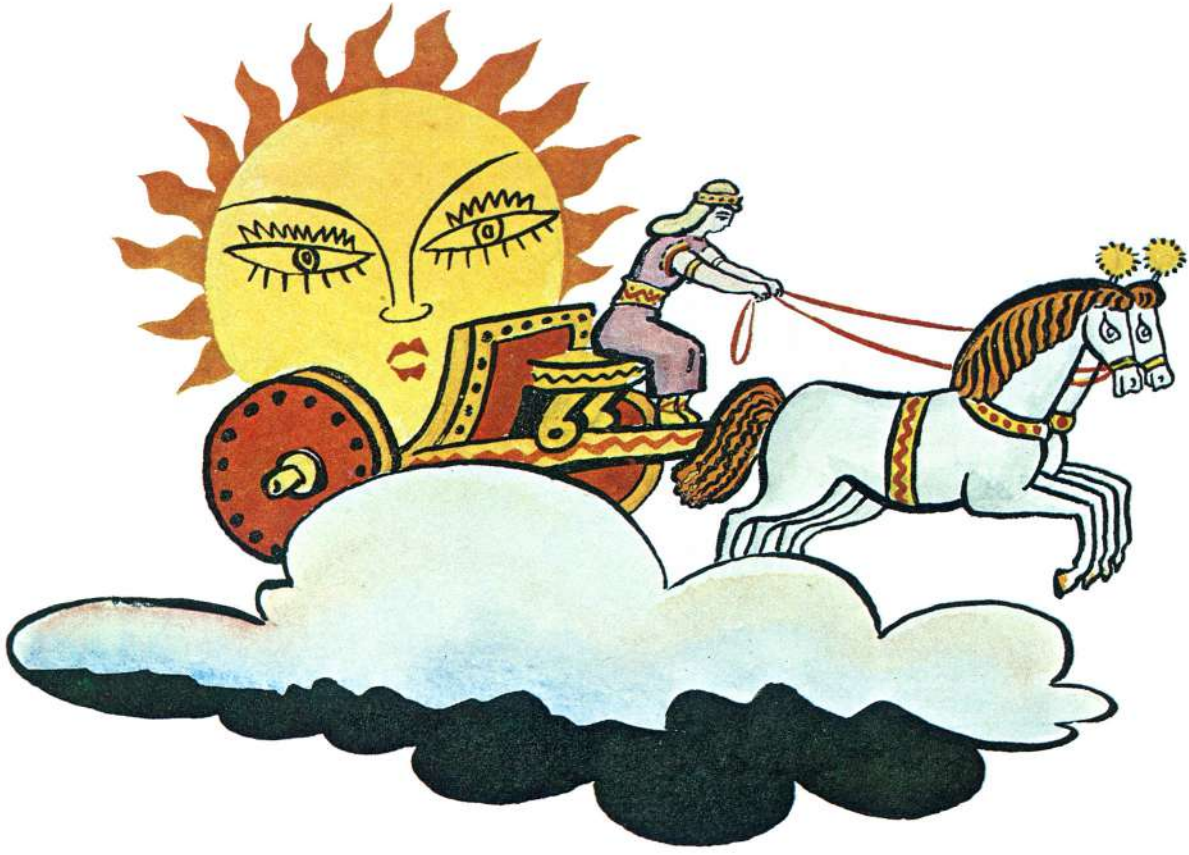
এবারে আরও একটি কাহিনী শোনো। এটা রচনা করেছে কঠিন আবহাওয়াপূর্ণ উত্তরের স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোর অধিবাসীরা।

অনেক অনেক কাল আগেকার কথা। সেই সময়কার কথা যখন না ছিল সূর্য না ছিল চাঁদ — তাদের কোন চিহ্নই ছিল না। পৃথিবীতে তখন রাজত্ব করত চিররাত্রির আঁধার। আর যেহেতু সূর্য ছিল না সেই হেতু গাছপালা শ্যামলিমা ধারণ করত না, ফুল ফুটত না, মাঠে পান্নারঙের ঘাস জন্মাত না।

তখন ওডিন নামে এক শক্তিমান দেবতা আর তাঁর ভাইয়েরা আগুনের দেশে গিয়ে সেখান থেকে আগুন নিয়ে এলেন। সেই আগুন থেকে ওডিন গড়লেন সূর্য আর চাঁদ। সূর্য আর চাঁদ দেখতে এত সুন্দর হল যে অমন সুন্দর জিনিস এর আগে দেবতা বা মায়াবী কেউই কখনও বানাতে পারেন নি।

এবারে যে কাজটি বাকি রয়ে গেল তা হল এমন কাউকে খুঁজে বার করা যে সূর্য আর চাঁদকে আকাশ পথে নিয়ে ঘুরবে।

সেই সময় পৃথিবীতে একজন লোক বাস করত, তার ছিল এক ছেলে আর এক মেয়ে। দু'জনেরই রূপের কোন তুলনা হয় না। ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে তাদের বাবার গর্বের অন্ত ছিল না। তার ধারণায়, পৃথিবীতে ওদের চেয়ে সুন্দর আর কিছুই থাকতে পারে না।

বাপ যখন দেবতাদের অপূর্ব সৃষ্টির কথা জানতে পারল তখন সে তার মেয়ের নাম দিল সুল্, অর্থাৎ সূর্য, আর ছেলের নাম দিল মানি, অর্থাৎ চাঁদ।

লোকটার এ রকম ঔদ্ধত্য দেবতাদের বরদাস্ত হল না। তাঁরা ওকে এর জন্যে কঠিন শাস্তি দিলেন।

দেবতা ওডিন সুল্ আর মানিকে আকাশে নিয়ে গেলেন, সূর্য আর চাঁদ — এই দুই স্বর্গীয় জ্যোতিকে নিয়ে আকাশপথে নিয়মিত ঘুরতে বাধ্য করলেন ওদের।

এর পর থেকে সুল্ রথের সামনের আসনে বসে একজোড়া সাদা ঘোড়া চালায়। রোজ সে আকাশপথে সূর্যকে নিয়ে ঘোরে, কেবল রাতের বেলায় সামান্য একটু বিশ্রামের অবকাশ পায়।

এদিকে ওর ভাই মানি আরেকটা রথে রাতের বেলায় চাঁদকে নিয়ে ঘোরে।

এর পর থেকে মাঠে দিব্যি শ্যামল শস্য ফলে, বাগানে ফল

রসে টৈটম্বুর হয়ে ওঠে, পাহাড়-পর্বতে শ্যামল অরণ্যের মর্মরধ্বনি ওঠে। মানুষ আনন্দ পায়, দেবতাদের কৃতজ্ঞতা জানায়।

কিন্তু ভাই-বোন অনেক সময় মনের দুঃখে কাঁদে। যখন তারা কাঁদে সেই সময় আকাশে সূর্য আর চাঁদ ঝাপসা দেখায়।

আচ্ছা, কিন্তু আসলে কি সূর্য নড়াচড়া করে? কেন তার উদয় ও অস্ত হয়, কেন সে সর্বক্ষণ ঝুলে থাকে না আকাশের এক জায়গায়?

তোমাদের মনে আছে কি কোন এক সন্ধ্যায় একটা বিশাল উজ্জ্বল বাতির পাশে নাগরদোলায় দোল খাওয়ার কথা? বাতিটা নাগরদোলার সামনে দেখা দিল, দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তার পর চলে গেল নাগরদোলার পেছনে। কিছুক্ষণের জন্য বাতির কোন পাত্তাই নেই, অন্ধকার। তার পর ফের এসে দেখা দিল, পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে তোমাদের ওপর আলো ফেলে, আবার চোখের আড়াল হয়ে গেল।

অথচ দেখ, আসলে কিন্তু বাতি নড়াচড়া করে নি। এক জায়গায় থেকে আলো দিচ্ছিল। ঘুরছিল নাগরদোলা, সেটাই তোমাদের কখনও আলো থেকে আড়াল করছিল কখনও বা আবার আলোর মধ্যে এনে ফেলছিল।

পৃথিবীতে লোকের অবস্থাও এই রকম। মহাকাশে ভূমণ্ডল যে নিছক সূর্যের চারধার দিয়ে ওড়ে এমন নয়। ভূমণ্ডল ওড়ে এবং সেই সঙ্গে নাগরদোলার মতো ঘুরপাকও খায়—কখনও সূর্য থেকে আমাদের আড়াল করে, কখনও বা আমাদের নিয়ে আসে সূর্যের আলোর দিকে।

কিন্তু আমাদের মনে হয় পৃথিবী বুঝি এক জায়গায় আছে আর সূর্য আমাদের চারপাশে ঘুরছে।

আমাদের এরকম মনে হওয়ার কারণ এই যে ভূমণ্ডল বিরাট, নিরেট। এরকম একটা প্রকাণ্ড ভারী জিনিস সাধারণ কোন লাটিমের মতো বন্ বন্ করে ঘুরতে পারে না। সে ঘুরতে থাকে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে, কোন রকম ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ও ঝাঁকুনি ছাড়াই।

নিজের অক্ষরেখার ওপর এক পাক ঘুরে আসতে ভূমণ্ডলের লাগে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। এই কারণে তার ঘোরা আমাদের নজরেই পড়ে না।

বড় একটা জাহাজে করে যখন সমুদ্রপথে ঘোর তখনও কিন্তু লক্ষ করতে পার না কখন সেটা ঘুরছে।

অবশ্য এটা ঠিক যে তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হলে তাকে দেখে বাঁক বোঝা যায়। কিন্তু তীরভূমি যদি দেখা না যায়? যদি জাহাজটা মাঝসমুদ্রে চলতে থাকে? সেক্ষেত্রে কেবল সূর্যের সাহায্যেই লক্ষ করা যায় যে জাহাজ বাঁক নিল। ধরো ডেকের যে দিকটাতে ছায়া পড়েছে সেই দিকে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তোমরা দেখতে পেলে তোমাদের গায়ের ওপর রোদ এসে পড়ছে। তার মানে জাহাজ তোমাদের ডেকটাকে সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে মোড় নিচ্ছে।

ভূমণ্ডলের বেলায়ও তাই।

সূর্য যখন বাড়িঘরের মাথার পেছন থেকে বা পাহাড়ের পেছন থেকে ওঠে তখন একবার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে দেখো। মনে হবে সূর্য আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে গুড়ি মেরে উঠছে। আসলে কিন্তু বিশাল একটা জাহাজের মতো আমাদের ভূমণ্ডলটা সূর্যকিরণের নীচে ধীরে ধীরে ঘুরছে।

পৃথিবীর যেই অর্ধভাগ সূর্যের দিকে মুখ করে আছে, সূর্য কেবল তাকেই আলোকিত করে। বাকি অর্ধাংশে সেই সময় অন্ধকার। সেখানে তখন রাত। তারপর ভূমণ্ডল যখন ঘুরে যায় তখন যেখানে দিন ছিল সেখানে নেমে আসে রাত, আর যেখানে ছিল রাত সেখানে নামে দিন।

ভূমণ্ডল কী ভাবে ঘুরছে তোমরা যাতে আরও স্পষ্ট বুঝতে পার তার জন্য ছবিতে আমরা ভূমণ্ডলকে একটা অক্ষদণ্ড দিয়ে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করেছি। আসলে কিন্তু অক্ষদণ্ড বলে কিছু নেই। এই রেখাটিকে আমরা কল্পনা করেছি মাত্র।

পৃথিবীর যে যে প্রান্তে এই কল্পিত অক্ষদণ্ডটি বেরিয়ে থাকার কথা তাকে বলা হয় মেরু। ওপরের বিন্দুটা উত্তরমেরু, নীচেরটা দক্ষিণ মেরু। আর দুই মেরুর মাঝখানে, ভূমণ্ডলের মধ্যদেশের নাম হল নিরক্ষবৃত্ত।

আমরা বাস করছি ভূমণ্ডলের ওপরকার অর্ধাংশে, নিরক্ষবৃত্ত ও উত্তর মেরুর মাঝখানে। এই অর্ধাংশের নাম উত্তর গোলার্ধ।

সূর্যকে ঘুরে যেতে পৃথিবীর অনেক সময় লাগে। পুরো একটা বছর লেগে যায় সূর্যের চারদিকে এক পাক ঘুরতে। এই সময়ের মধ্যে নিজের অক্ষদণ্ডের ওপরে পৃথিবী পাক খায়, ৩৬৫ বার। এই কারণে বছরে আছে ৩৬৫টি দিন আর ৩৬৫টি রাত।

সূর্যের মতো চাঁদও প্রতিদিন ওঠে, প্রতিদিন অস্ত যায়। যদি তোমরা বেশ মন দিয়ে তারাদের দিকে তাকিয়ে দেখ তাহলে লক্ষ করবে যে তারাভরা পুরো আকাশটাও যেন খুব আস্তে আস্তে ঘুরছে। কোন একটা উজ্জ্বল তারার দিকে ভালো করে নজর দিয়ে দেখ। তারাটা এখন এখানে। এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সে নজরে পড়ার মতো স্থান পরিবর্তন করবে। আর

অক্ষদণ্ড উত্তর মেরু

দক্ষিণ মেরু অক্ষদণ্ড

আগামীকাল ঠিক এই একই সময় পুরো একটা পাক দিয়ে আসার পর তাকে ফের দেখা যাবে তার আগের জায়গায়।

এটা ঘটার কারণ এই যে পৃথিবী সব সময়ই ধীরে ধীরে ঘোরে। আমরা এই বিশাল নাগরদোলাটায় বসে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরপাক খাই। আমাদের তাই মনে হয় আমাদের চারধারে গোটা পৃথিবীটা, গোটা মহাকাশ ঘুরপাক খাচ্ছে।

এখন কল্পনা করে দেখো নাগরদোলার মাথায়, তার ছাদের ওপরে যেখানে সচরাচর একটা নিশান থাকে তোমরা সেখানে চড়ে বসলে। নাগরদোলা ঘুরপাক খাচ্ছে আর তোমরা মাথা উঁচু করে আকাশ দেখছ। তোমাদের চারদিকে ঘরবাড়ি গাছপালা ছুটছে। কিন্তু সরাসরি তোমাদের মাথার ওপরে যে আকাশ, তা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। দেখে মনে হয় যেন এখানে 'পেরেক' পোঁতা হয়েছে, বাদবাকি আর সব কিছু পিচবোর্ডের ওপর আঁকা, আর পিচবোর্ড এই 'পেরেকটার' গায়ে আঁটা হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

পৃথিবীর মেরু নাগরদোলার মাথার মতো। আমরা যদি মেরুপ্রদেশে থাকি তাহলে মেরুতারা বা ধ্রুবতারা সরাসরি আমাদের মাথার ওপর দেখতে পাব। তোমাদের মনে আছে আমরা এর কথা বলেছিলাম? তাহলে দেখতে পাচ্ছ এই সেই 'পেরেক'।

ভূমণ্ডল ধীরে ধীরে ঘোরে। আমাদের মাথার ওপরকার পুরো আকাশটা যেন ঘুরপাক খেতে খেতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু ধ্রুবতারা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

তারাভরা আকাশকে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাবে যদি আমরা মেরুপ্রদেশ থেকে সরে আসি নিরক্ষবৃত্তে। এখান থেকে ধ্রুবতারা দেখলে মনে হবে যেন উত্তরমেরুর দিককার দিগন্তের ওপর স্থির হয়ে পড়ে আছে। নিরক্ষবৃত্তে দাঁড়িয়ে যদি আমরা পুবের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পারি থিয়েটারের বিশাল পর্দার মতো তারাভরা আকাশ তার মহিমাদীপ্ত রূপ নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে; এদিকে পশ্চিমে তারাগুলো ঠিক একই রকম খাড়াভাবে নেমে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে।

নিরক্ষবৃত্তে সূর্য ও চাঁদ কী ভাবে অস্ত যায় তা লক্ষ করাও কৌতূহলোদ্দীপক। তারাদের মতো সূর্য আর চাঁদও নেমে যায় একেবারে খাড়াভাবে। দেখে মনে হয় কেউ যেন তাদের একটা সুতোয় ঝুলিয়ে রেখেছিল, এখন ডুবোচ্ছে দিগন্তের ওপাশে।

আমরা যেখানে বাস করি সে জায়গাটা মেরুপ্রদেশও নয়, নিরক্ষবৃত্তও নয়। আমরা বাস করি মাঝখানে। তাই ধ্রুবতারাও আমাদের মাথার ওপর দেখা যায় না, দেখা যায় তার থেকে খানিকটা নীচে। এই কারণে আমাদের এই অংশে চন্দ্র-সূর্য যখন ওঠে তখন মনে হয় যেন পাহাড়ের ঢাল বয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে, আবার অস্ত যাওয়ার সময় ঢাল বয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামে।

এই যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, তার কারণ পৃথিবী একটা গোলক, আর সেই গোলকটা ঘুরপাক খাচ্ছে।
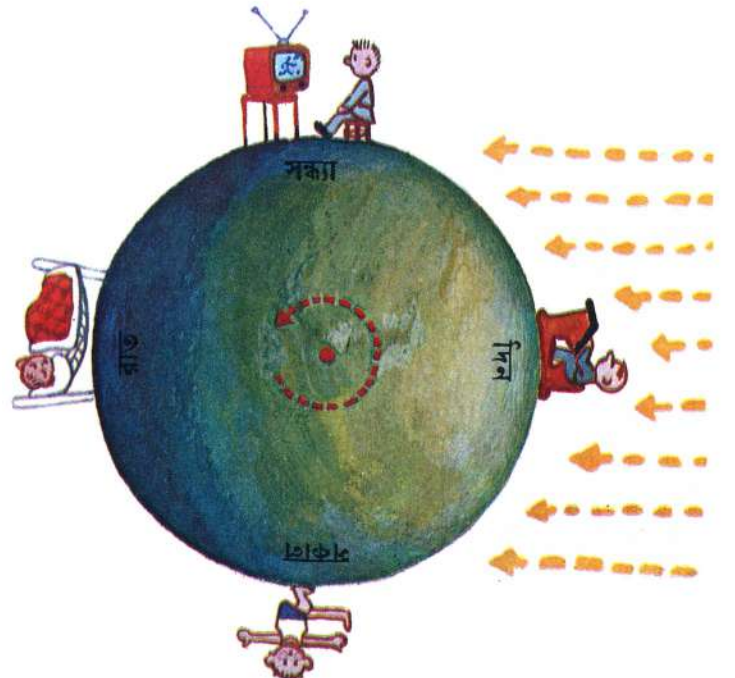
গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ বেশি কেন?

শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ কেন বেশি হয়? গ্রীষ্মকালে পৃথিবী কি তাহলে সূর্যের খানিকটা কাছে চলে আসে? তা-ই যদি হত তাহলে গ্রীষ্মকালে আকাশে সূর্য শীতকালের সূর্যের চেয়ে বড় দেখাত। যে কোন জিনিস কাছ থেকে বড় দেখায়, দূর থেকে—ছোট। অথচ আকাশে সূর্যের আকার কি গ্রীষ্মে কি শীতে—সব সময় এক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে-'চুল্লির আগুন' থেকে আমরা তাপ পাচ্ছি সেটা কত দূরে অবস্থান করছে ব্যাপারটা আসলে সেখানে নয়।

তোমাদের মনে আছে কি সূর্য গ্রীষ্মকালে আকাশের কোন্ জায়গায় থাকে, শীতকালেই বা কোন্ জায়গায়? গ্রীষ্মকালে অনেকটা ওপরে ওঠে। আর সূর্য আকাশের যত ওপরে থাকে তার কিরণও তত প্রখর হয়। এই দেখ না কেন, দিনের বেলায় সকালের চেয়ে বেশি উত্তাপ দেয়, তাই না? শুধু তা-ই নয় গ্রীষ্মকালের দিন শীতকালের দিনের চেয়ে অনেক বেশি বড়। গ্রীষ্মকালে সূর্য অনেক সকাল-সকাল ওঠে, অস্ত যায় বেশ দেরি করে। দিন বড় বলে সূর্য বায়ু আর পৃথিবীকে এবং তোমাকে আমাকেও ভালো মতো গরম করে তোলার সময় পায়। এই কারণে শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে তাপ বেশি।

গ্রীষ্মকালের পর আসে শরৎকাল। দিনে দিনে সূর্য আকাশের আরও নীচে দিয়ে চলতে থাকে। সে ক্রমেই দেরি করে উঠতে থাকে, দিগন্তের ওপারে অস্ত যেতে থাকে আরও আগে আগে। দিন দিন সে আরও কম তাপ আর আলো আমাদের পাঠায়। আরও বেশি ঠাণ্ডা আরও বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসতে থাকে।

শীত নামে। ডিসেম্বরে আকাশে সূর্যের আবির্ভাব ঘটে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য, তাও আবার সব সময় তাকে চোখে দেখা যায় না। আকাশের গায়ে একেবারে নীচে সে অবস্থান করছে—ঘরবাড়ি ও গাছপালার আড়ালে কোথাও লুকিয়ে পড়ছে।

উত্তরের দেশগুলোতে অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে শীতকালে সূর্য হয়ে পড়ে আরও দুর্বল। কোন রকমে দিগন্তের ওপরে গিয়ে ওঠে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তার ওঠার আর কোন শক্তিই থাকে না। কেবল ঘণ্টাখানেকের মতো আকাশে আলো দেয়—এর বেশি সামর্থ্য তার থাকে না। আবার ফিরে আসে রাত। তারপর কয়েক দিন বাদে আকাশে আলো দেওয়াও বন্ধ করে। এর পরে কয়েক সপ্তাহের মতো ঘনিয়ে আসে নিশ্ছিদ্র রাত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে। সর্বত্র অন্ধকার, কালিমা।

কিন্তু নিজেকে যতই সান্ত্বনা দাও না কেন প্রতিবারই আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। আচ্ছা যদি হঠাৎ সূর্য আমাদের একেবারে ছেড়ে চলে যায়? যদি এই অন্ধকার আর ঠাণ্ডা কখনই শেষ না হয়? তাহলে মানুষ বাঁচবে কী করে? আমাদের উদ্ধারের উপায় তাহলে কী?

অতীতে লোকে আরও আতঙ্ক বোধ করত। কোন পুথিপত্র ছিল না, স্কুল-কলেজ ছিল না। লোকে কিছু বুঝে উঠতে পারত না। কারও কাছে যে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে সে উপায়ও ছিল না।

তারা বিষণ্ণ মনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত সূর্য চলে যাচ্ছে, শৈলচূড়া কালো হয়ে আসছে, অরণ্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। এই দেখে তারা নানা কাহিনী রচনা করত।

শীতকালে যেখানে সূর্য দীর্ঘ সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায় সেই উত্তরের দেশ ঐ সমস্ত কাহিনীতে হল অন্ধকার আর ঠাণ্ডার এক ভয়ংকর দেশ — পোহিওলা। পোহিওলায় রাজত্ব করত লৌহি নামে এক খল ডাইনী-বুড়ি।

তার সামান্য দূরে সূর্যের দেশ কালেভালাতে বাস করত তিনজন ভালোমানুষ মহাবীর।

প্রথম জন জ্ঞানী, বৃদ্ধ ভিয়াইনেমেইনেন। সে এত সুন্দর গান গাইতে পারত যে বনের পশুপাখিরা পর্যন্ত ভিড় করে শুনতে আসত।

দ্বিতীয় জন ইল্‌মারিনেন, এক কামার। ভালো কারিগর। কাজে তার ক্লান্তি নেই। তার হাতের কাজের কোন তুলনা হয় না।

তৃতীয় জন লেম্‌মিন্‌কিয়াইনেন, এক নির্ভীক, ফুর্তিবাজ শিকারী।

ভয়ংকর দেশ পোহিওলা এই তিন মহাবীরকে প্রলুব্ধ করে। প্রলুব্ধ করে এই জন্য যে বুড়ি লৌহির একটা বড় সুন্দরী মেয়ে আছে। সুন্দরী আকাশে, সাতরঙা রামধনুর ওপরে বসে বসে রুপোর তাঁতে সোনার কাপড় বোনে।

মহাবীরেরা একে একে সুন্দরীর পাণিপ্রার্থনা করল। কিন্তু সুন্দরী ছিল খামখেয়ালি। তিনজনকেই সে ফিরিয়ে দিল।

বুড়িও পাত্রদের নাকাল করতে ছাড়ল না। তাদের যে সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে লাগল সেগুলো একটা আরেকটার চেয়ে শক্ত। তারপর ভাগিয়ে দিতে লাগল নানা অজুহাতে।

কেবল ডাইনী শেষ পর্যন্ত কামার ইল্‌মারিনেনের হাতে তার মেয়েকে সমর্পণ করল। কারণ এই যে লোভী ডাইনীর জন্য কামার তৈরি করে দিয়েছিল এক মায়া যাঁতাকল — সাম্‌পো। এই যাঁতাকলে কিছুই পোরার দরকার হত না, তাকে ঘোরাতেও হত না। আপনাআপনিই কল ঘুরতে থাকে আর সেখান থেকে ময়দা, নুন, এমনকি দরকার হলে টাকাপয়সা পর্যন্ত, অর্থাৎ লৌহি যা ইচ্ছে করে তা-ই ঝরে পড়ে।

ইল্‌মারিনেন ত তার তরুণী বধূটিকে নিজের বাড়িতে এনে তুলল। কিন্তু দেখা গেল মেয়েটি মোটেই সুবিধের নয়, বদমেজাজী। একবার সে তার রাখালের জন্য রুটি সেঁকতে গিয়ে সেই রুটির মধ্যে পাথর পুরে রাখল। রাখাল রেগে গিয়ে গোরুর পালকে এক পাল নেকড়ে করে ফেলল। নেকড়ের পাল সঙ্গে সঙ্গে বদমেজাজী কর্ত্রীটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

তখন মহাবীরেরা ঠিক করল বুড়ি লৌহির কাছ থেকে ঐ মায়া যাঁতাকল সাম্‌পো নিয়ে নেওয়া উচিত। বুড়ি কেবল নিজের জন্য ধনসম্পদ জমাচ্ছে, কিন্তু যাঁতাকলটা ওদের হাতে থাকলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সুখসমৃদ্ধি আনতে পারে।

পোহিওলার সমস্ত যোদ্ধা মহাবীরদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য বেরিয়ে এলো। কিন্তু ভিয়াইনেমেইনেন তার গান ধরতেই ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। মহাবীরেরা তখন বুড়ির ভাণ্ডারের দরজা খুলে ফেলল, যাঁতাকল সাম্‌পো বার করে এনে নৌকোয় করে সমুদ্রপথে বাড়ি নিয়ে চলল।

ইতিমধ্যে বুড়ির ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভেঙে দেখে সাম্‌পো নেই। ডাইনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে মহাবীরদের পিছু ধাওয়া করল। ওদের ওপর কুয়াশা ছেড়ে দিল। কুয়াশা জড়িয়ে ধরল মহাবীরদের নৌকো। মহাবীরেরা কিন্তু তাতে ভয় পেল না। ভিয়াইনেমেইনেন ঝট করে তলোয়ার বার করে তাই দিয়ে কুয়াশা কেটে ফেলল। দুষ্ট

ডাইনী তখন নৌকোর গায়ে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঢেউ ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু সে বিপদও কাটিয়ে উঠল মহাবীরেরা। তখন লৌহি সাহায্যের জন্য বাতাসকে ডেকে আনল। বাতাস ঝড় তুলে নৌকোর ওপর আছড়ে পড়ল। কিন্তু দুঃসাহসী বীরেরা তাকেও কাবু করে ফেলল।

বুড়ি ডাইনী রাগে অন্ধ হয়ে উঠে পোহিওলার সমস্ত লোকজনের মধ্যে হুলস্থুল ফেলে দিল। আগন্তুকদের প্রতি ঘৃণার বশে তারা সকলে বুড়ি ডাইনীর সঙ্গে মিলে ওদের পিছু ধাওয়া করল। ওঃ কী তুমুল লড়াইটাই না হল! কিন্তু সে যাই হোক না কেন, মহাবীরদের বিনাশ করা গেল না।

মাঝখান থেকে কেবল যাঁতাকলটাই সমুদ্রে পড়ে গিয়ে ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ ভিয়াইনেমেইনেন যাঁতাকলের ভাঙা টুকরোগুলোকে জড় করল। বনের ভেতরকার একটা ফাঁকা জায়গায় এসে সেগুলো এক সঙ্গে জোড়া দিয়ে বলল: 'কালেভালা দেশের সুখসমৃদ্ধি হোক!'

সঙ্গে সঙ্গে বাতাস মাঠের ফসল মাড়ানো বন্ধ করে দিল, হিম বন্ধ করল নবাঙ্কুর নষ্ট করা, মেঘ করুণাময় সূর্যের ওপর থেকে তার আবরণ সরিয়ে নিতে লাগল।
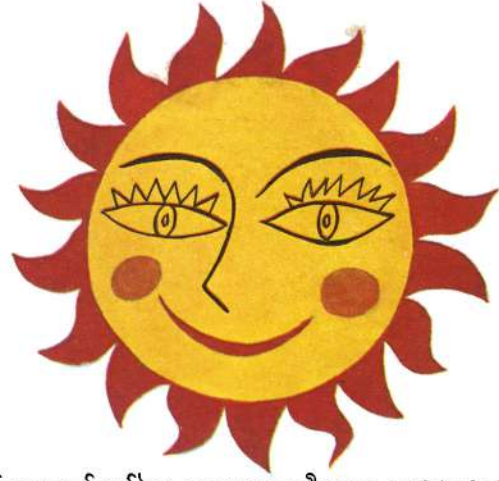
এদিকে বুড়ি ঠিক করল মহাবীরদের ওপর চরম প্রতিহিংসা নেবে। মনে মনে এমন একটা ফন্দি আঁটল যার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এমন সাধ্য কারও নেই।

ভিয়াইনেমেইনেন যখন বনের ভেতরে গান গাইছিল, বুড়ি সেই সময়টা বেছে নিল। ভিয়াইনেমেইনেন এত চমৎকার গান গাইছিল যে সূর্য-চন্দ্র পর্যন্ত তার গান শোনার জন্য নীচে নেমে এসে ফার গাছের ঝাঁকড়া ডালপালার ওপর বসল।

ঠিক এই সুযোগে পাজী বুড়িটা গুড়ি মেরে এগিয়ে এসে খপ করে সূর্য আর চাঁদকে চেপে ধরল, তাদের ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে, বন্ধ করে রেখে দিল মাটির তলার কুঠরীতে।

নেমে এলো অন্ধকার আর কনকনে ঠাণ্ডা। সূর্য আর ওঠে না। পৃথিবীকে কেউ উত্তাপ দেয় না। হিম এসে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। এমনকি চাঁদও বনজঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতকে আলো দেয় না।

কালেভালা দেশের দুঃসময় ঘনিয়ে এলো।

ঘন আঁধারে ও ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় লোকে কাবু হয়ে পড়ল।

সূর্য না থাকায় অবস্থা হল কঠিন। বড় কঠিন সে অবস্থা!

এদিকে বুড়ি মহাবীরদের ওপর প্রতিশোধ নিল বটে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে ভীতি তার গেল না।

অন্ধকারে ও ঠাণ্ডার মধ্যে মহাবীরেরা কী করে দেখার জন্য সে একটা বাজপাখির রূপ ধরে উড়ে চলল। তার কৌতূহল হল ওরা মারা গেছে, নাকি তখনও ভয়ে থরথর কাঁপছে।

উড়তে উড়তে নীচে নেমে এলো। এসে কী দেখল? দেখে কি কামার ইলমারিনেন বহাল তবিয়তে আছে, কামারশালায় কী যেন একটা গড়ছে। বুড়ি জিজ্ঞেস করল, 'কী তৈরি করছ তুমি?' ইলমারিনেন বলল, 'আমি? আমি লোহা পিটিয়ে পাজী বুড়ি লৌহির জন্য একটা গলার বেড়ি বানাচ্ছি। ওটাকে আমি শেকলে বেঁধে তামার পাহাড়ের পাথুরে চূড়ার সঙ্গে আটকে রাখতে চাই।'
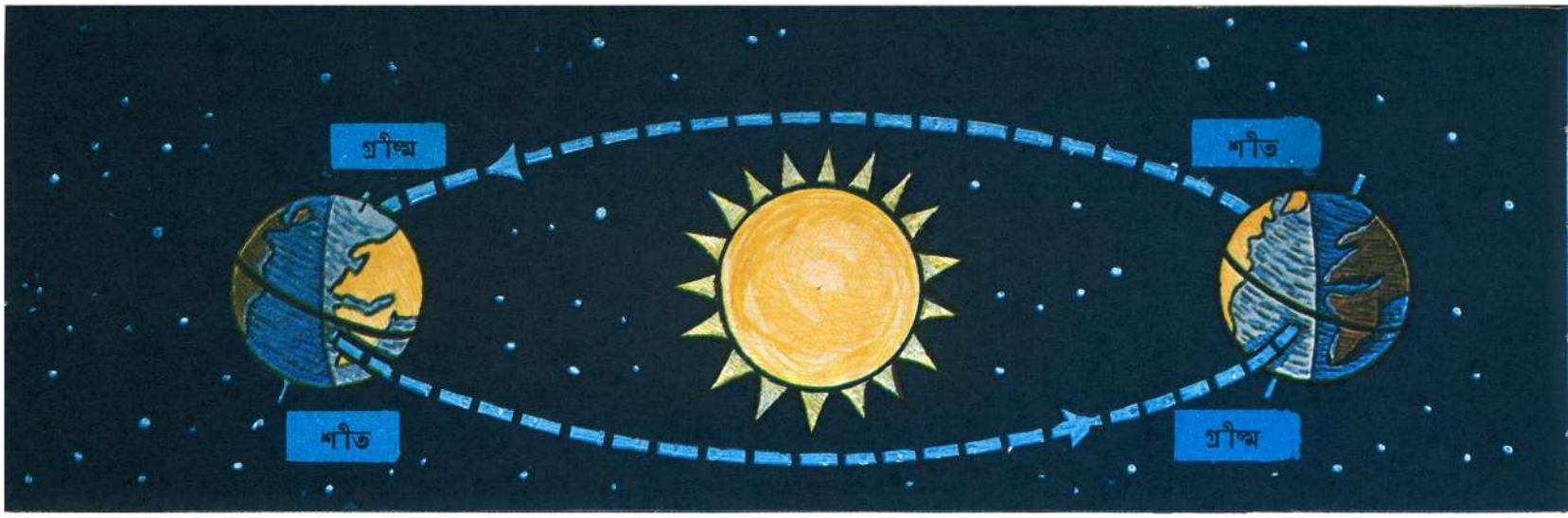
বুড়ি বুঝতে পারল মহাবীরদের সঙ্গে তার কোন জারিজুরি খাটবে না। পৃথিবীতে চির আঁধার ও ঠান্ডার মতো ভয়ঙ্কর আর কী হতে পারে? কিন্তু তাতেও ওরা মরল না। হতাশ হয়ে সে উড়ে চলে গেল পোহিওলায় তার নিজের বাড়িতে। মাটির তলার কুঠুরী খুলে ছেড়ে দিল সূর্য আর চাঁদকে।

কালেভালা দেশে আবার আলো দেখা দিল, উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল।

এখন আর তাই শীতকালে সূর্য পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেও লোকে ভয় পায় না। ভয়ঙ্কর দেশ পোহিওলার কর্ত্রী, দুষ্ট ডাইনী হার মানল। তাকে হার মানতে হল মানুষের কাছে, যে মানুষ অন্ধকার বা ঠান্ডা কোনটাকেই ডরায় না।

সুন্দর গল্প, তাই না?

আচ্ছা এসো, এবারে দেখা যাক আসলে কেন এমন হয়? — কেন সূর্য শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে একই রকম ভাবে আকাশে চলাচল করে না? অথচ দেখ, পৃথিবী কিন্তু সব সময় একই রকম ভাবে ঘুরছে।

সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী 'পৃথিবীর অক্ষদন্ড'। অক্ষদন্ডটি আসলে হেলানো। এই কারণে পৃথিবী ঠিক নাগরদোলার মতো সোজা দাঁড়িয়ে ঘুরপাক না খেয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে

সামান্য কাত হয়ে। আর পৃথিবী হেলে আছে সব সময় একই পাশে। এখানেই হল আসল রহস্য।

আমাদের আঁকা ছবিতে পৃথিবীর অক্ষদণ্ড ডান দিকে হেলানো। পৃথিবী সূর্যের চারধারে উড়ে চলেছে, এর ফলে তার ওপরের অর্ধেকটা, উত্তর গোলার্ধ কাত হয়ে কখনও সূর্যের দিকে আসে, কখনও বা সূর্যের কাছ থেকে সরে যায়।

একবার দেখ, উত্তর গোলার্ধ যখন সূর্যের দিকে কাত হয়ে থাকে তখন কী হয়।

পৃথিবী ধীরে ধীরে ঘোরে। আমরা তার ওপরে আছি। যখন আমরা আলো ও অন্ধকারের সীমানার কাছাকাছি চলে আসি তখন আমরা সূর্যোদয় দেখতে পাই। ছবিতে এই জায়গায় লেখা আছে 'সকাল'।

তারপর আমরা আমাদের পৃথিবী-নাগরদোলায় চেপে সারাদিন ধরে সূর্যকিরণের নীচ দিয়ে চলতে থাকব। দুপুরবেলায় সূর্য আকাশে ঝুলতে থাকবে প্রায় সরাসরি আমাদের মাথার ওপরে।

আরও কিছু সময় পরে সূর্য চলে যাবে দিগন্তরেখার পেছনে। যেখানে 'সন্ধ্যা' শব্দটি লেখা আছে আমরা যখন তার কাছাকাছি চলে আসব তখন সূর্য আমাদের আর আলো দেবে না।

এবারে দেখ, রাত কী ছোটই না হবে!

গ্রীষ্মকালে সূর্যকিরণের নীচ দিয়ে আমরা কত দীর্ঘ পথই না যাত্রা করি, আর কত অল্প পথই না আমাদের যেতে হয় ছায়ার নীচ দিয়ে!

অতএব দিন এত বড় আর রাত এত ছোট হয় বলেই এবং সূর্য যেহেতু ওপর থেকে, সরাসরি আমাদের মাথার ওপর কিরণ দেয় সেই কারণে গরম লাগে। গ্রীষ্মকাল শুরু হয়।

একেবারে উলটোটা ঘটে যখন পৃথিবী সরে যায় অন্য দিকটায়। উত্তর গোলার্ধ তখন আর সূর্যের দিকে কাত হয়ে না থেকে সূর্যের কাছ থেকে কাত হয়ে সরে যায়। নিজের কক্ষপথে পৃথিবীর প্রতিবার আবর্তনের সময় আমাদের অনেকক্ষণ ছায়ায় বসে থাকতে হচ্ছে। পৃথিবী নামক নাগরদোলাটি মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাদের নিয়ে আসে সূর্যকিরণের নীচে, তারপর আবার অনেকক্ষণের জন্য নিয়ে যায় ছায়ায়।

আমাদের রাতের পথ হয় দীর্ঘ, আর দিনের পথ ছোট। দিনের বেলায়ও এখন আর গ্রীষ্মকালের মতো সূর্য খাড়া ভাবে আমাদের ওপর আলো ফেলে না, ফেলে পাশ থেকে।
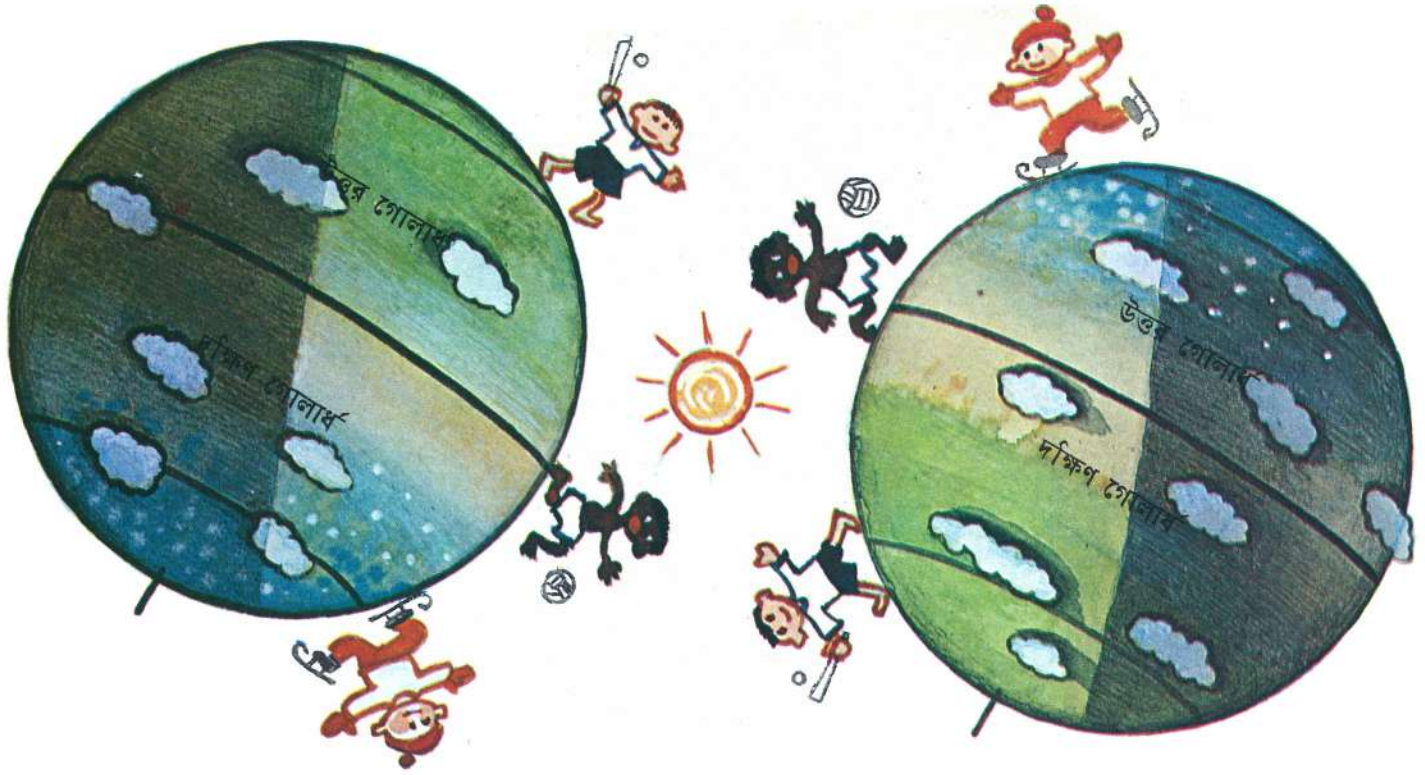
তার রশ্মি হয় ম্লান। পৃথিবীর ওপর সূর্যরশ্মি তেরছা ভাবে পিছলে পড়ে। পৃথিবীকে তেমন একটা গরম করতে পারে না।

আমাদের ঠান্ডা লাগে। শীত নামে।

আমরা যদি বিষুবরেখার কাছাকাছি কোথাও বাস করতাম তাহলে আমাদের কখনই ঠান্ডায় জমে যেতে হত না, ওভারকোট গায়ে দিতে হত না। বছরের যে-কোন ঋতুতে সেখানে সূর্য সরাসরি ওপর থেকে কিরণ দেয়। সূর্য অনেক অনেক ওপরে উঠে যায়।

তাই বিষুবরেখার কাছাকাছি দেশগুলোতে সব সময়ই বেজায় গরম। ঐ দেশগুলোকে বলাও হয় 'গরম দেশ'।

ঠান্ডা কাকে বলে, বরফ কী — ঐ সমস্ত দেশের অধিবাসীরা তা জানেই না।

আবার বিষুবরেখার ওপারে, ভূমন্ডলের নীচের অর্ধাংশে ফের পাবে শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে আমাদের এখানে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। আবার আমাদের এখানে যখন শীত তখন ওখানে নামে গ্রীষ্ম।

তোমরা এতক্ষণ সম্ভবত অনুমান করতে পেরেছ কেন এমন হয়। পৃথিবীর ওপরের অর্ধাংশ যখন সূর্যের দিকে হেলে থাকে তখন নীচের অর্ধাংশ তার দিক থেকে ঘুরে যায়। আবার ওপরের অর্ধাংশ যখন মুখ ঘুরিয়ে থাকে তখন নীচের অর্ধাংশ সূর্যের কিরণে গরম হয়ে যায়।

জানুয়ারী আমাদের সবচেয়ে ঠান্ডা মাস। এটাতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কথাই ধর না কেন — সেখানে জানুয়ারী ভর গ্রীষ্মকাল। মে মাস সেখানে শরৎকাল, জুলাইতে কঠিন শীত, আর সেপ্টেম্বরে কিশলয় দেখা দেয়, সর্বত্র সবুজের সমারোহ, তখন বসন্তের সমাগম।

সেখানে সবই উলটো। তার কারণ এই যে আমাদের দেশ আর অস্ট্রেলিয়া ভূমন্ডলের দুই ভিন্ন ভিন্ন অর্ধাংশে অবস্থান করছে। আমরা আছি উত্তর গোলার্ধে, আর অস্ট্রেলিয়া — দক্ষিণ গোলার্ধে।

তাহলেই বুঝে দেখ পৃথিবীর অক্ষদন্ড কাত হয়ে থাকার ফলে কী মজার ব্যাপার ঘটছে! কিন্তু পৃথিবী যদি সত্যিকারের নাগরদোলার মতো 'খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে' ঘুরপাক খেত তাহলে সমস্ত জিনিসটা হত একেবারে অন্যরকম।

সূর্য তাহলে সারা বছর আমাদের এক রকম ভাবে উত্তাপ দিত। আর ঋতু বলে কিছু থাকত না। দুই মেরুর কাছাকাছি জায়গায় হত চিরশীত, বিষুবরেখার কাছাকাছি জায়গায় — চিরগ্রীষ্ম। আর ইউরোপে সব সময় কাদা প্যাচপ্যাচ করত — না বসন্ত না শরৎ।

তখন আর টিলার ওপর থেকে স্কী করার মতো অবস্থা থাকত না, সাগরবেলায় সূর্যস্নানও করা যেত না। না এদিক না ওদিক অবস্থা হত। বারো মাস রবারের বুট পরে ছাতা হাতে পথ চল। বড় বিশ্রী লাগত, তাই না?

পৃথিবীর অক্ষদন্ড যে হেলানো সেটা ভালোই বলতে হবে!

চাঁদ কেন ফালি?

সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীই বিশাল বিশাল গোলক। এই কারণে সূর্যকে সব সময় গোল দেখায়।

অথচ চাঁদ কেন যেন কেবল কখন-সখন গোল, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই ফালি।

চাঁদের বাকি অংশ তাহলে যায় কোথায়? কে তাকে গ্রাস করে?

একবার তাকিয়ে দেখ রাস্তার বাতির ঝাপ্‌সা গোল আলোটার দিকে। যেদিক থেকেই দেখ না কেন, একই রকম গোল। তার কারণ ওটা একটা বাতি, সূর্যের মতো নিজে আলো দেয়।

কিন্তু দেখ, রেলিং-এর মাথার ওপরকার ঐ গোল পাথরটা নিজে কোন আলো দেয় না। বাতির আলোয় সেটা আলোকিত, আর আলোকিত কেবল তার একটা দিক।

এবারে এই গোল পাথরটাকে ঘর থেকে, একটা আলোকিত পর্দার ভেতর থেকে দেখ। গোলকটার অন্ধকার দিক এখন একেবারে দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে কেবল আলোকিত অর্ধাংশ। তবে গোলকের ফালিটা কমলালেবুর কোয়ার মতন।

চাঁদের ক্ষেত্রেও তাই। চাঁদও কিন্তু একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গোল পাথর। সূর্য হল বাতি। এই বাতি চাঁদের একটা দিক
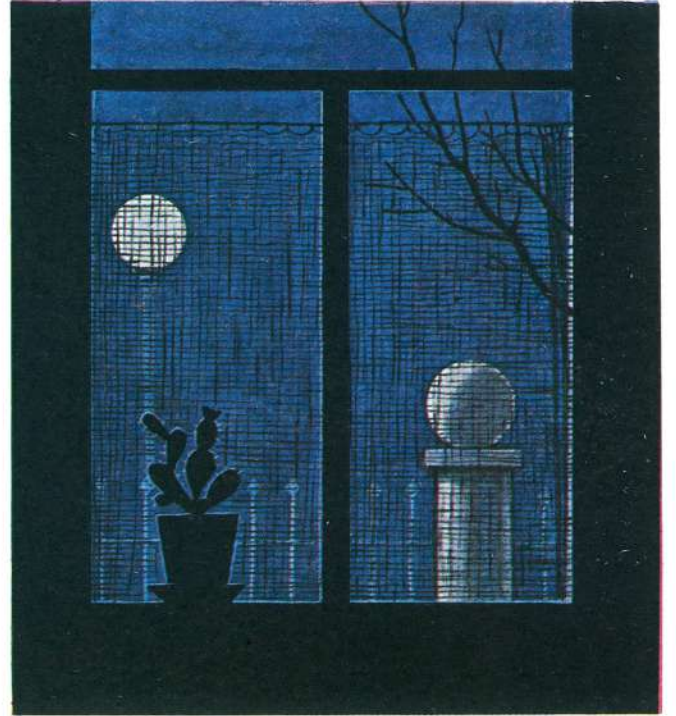
আলোকিত করে। আর নীল আকাশের ভেতর দিয়ে দেখা যায় কেবল চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সূর্য আর সূর্যালোকে উজ্জ্বল আলোকিত চন্দ্রকলা। অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্ধাংশ চোখে পড়ে না। ঘোলাটে বায়ু তাকে দেখার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ঐ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে তারাও দেখা যায় না, যদিও দিনের বেলায় সব তারাই তাদের যার যার জায়গায় থাকে। দিনের বেলায় কেউ ত আর তাদের নিভিয়ে দেয় না!

রাতের বেলায় বায়ু থাকে ছায়ায়। তখন সূর্য তাকে আলোকিত করে না। রাতে তা হয় স্বচ্ছ, বাতি নিভিয়ে দিলে যেমন হয় পর্দার অবস্থা। তখন তার ভেতর দিয়ে সব দেখা যায়। বায়ুর ভেতর দিয়ে তারাদের দীপ্তি প্রকাশ পেতে থাকে।

অনেক সময় রাতে বায়ু বিশেষভাবে নির্মল ও স্বচ্ছ হয়— বিন্দুমাত্র ধুলো বা মেঘ তাতে থাকে না। তখন অতি দুর্বল, অতি খুদে খুদে তারাদেরও দেখা যায়। ঐ রকম রাতে চাঁদের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশও চোখে পড়ে।

আচ্ছা চাঁদ কেন নানা আকারে দেখা যায়? — কখনও গোটা, কখনও একটা মোটা ফালি, কখনও বা কাস্তের মতো একটা সরু ফালি? তার কারণ এই যে চাঁদ আমাদের চারদিকে ঘোরে — এই যেমন আমাদের ছবিতে দেখছ — দড়ি বাঁধা কুকুরছানার মতো।

ছবিতে দেখছ ত, কুকুরছানার মুখের ওপর অনেক সময় বেশ আলো পড়েছে, অনেক সময় আলো পড়েছে তার অর্ধেক মুখের ওপর। তারপর কুকুরছানা যখন ছুটতে ছুটতে বাতির ওপাশে চলে গিয়ে আলোর উলটো দিকে দাঁড়ায় তখন তার গোটা মুখটাই অন্ধকার দেখায়। মুখ একেবারে নিরীক্ষণ করা যায় না! কেবল চকচক করে মুখের চারপাশের হালকা উজ্জ্বল রেখা — চাঁদের সরু 'কাস্তের' মতন।
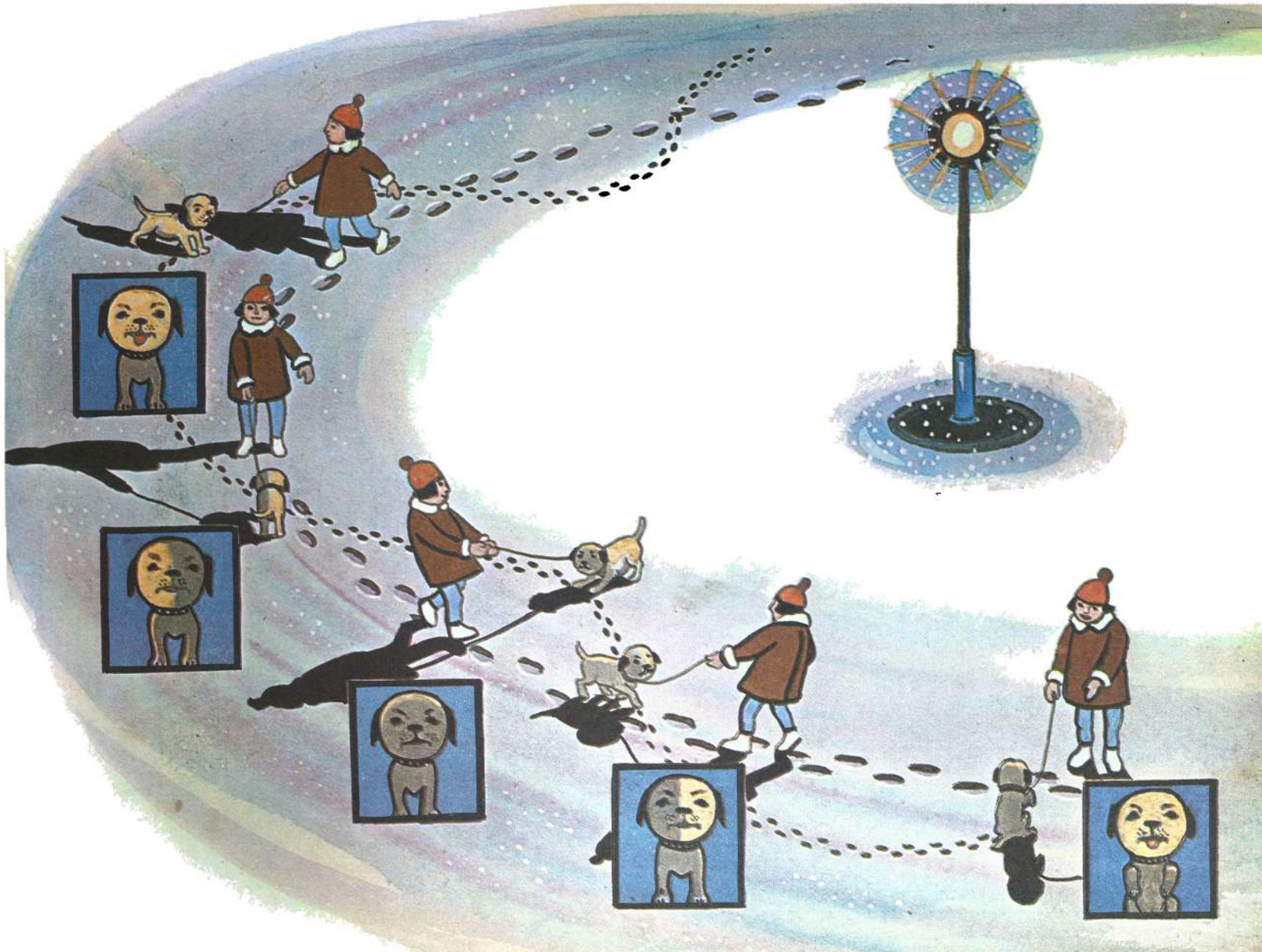
চাঁদে কী আছে?

এখন কিন্তু আমরা জানি যে চাঁদ হল একটা প্রকাণ্ড পাথরের গোলা। সে সগৌরবে মহাকাশে ভাসতে ভাসতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে।

আচ্ছা, আগেকার দিনে যখন টেলিস্কোপ ছিল না তখন লোকে কী করত? তারা স্রেফ চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, আরও ভালো করে তাকে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করত আর ভাবত, কেবলই ভাবত। আন্দাজে বোঝার চেষ্টা করত চাঁদটা কী।

চাঁদের নীল-নীল রূপোলি আলোয় সব কিছু যেন রহস্যময়, হেঁয়ালিপূর্ণ। গাছপালা স্থির। জলের গায়ে ঝলমল করছে আলোর রেখা। নিস্তব্ধতা।

শশী হল নৈশ রূপকথার রানী।

তাকে নিয়ে লোকে অনেক রূপকথা রচনা করেছে।

সোভিয়েত দেশের দক্ষিণে কিরগিজিয়ায় চাঁদ সম্পর্কে লোকে এই রকম একটা রূপকথা রচনা করেছে।

কোন এক সময় চাঁদ নামে এক ধনী খান ছিল। তার ছিল শশী নামে এক সুন্দরী মেয়ে।

সাগরপারের বহু মহাবীর সুন্দরী শশীর মন জয় করতে চাইল, তার পাণিপ্রার্থনা করল, তাকে বধূ করতে চাইল। কিন্তু সবাইকে তাড়িয়ে দিল খানের মেয়ে, কেননা সে ভালোবাসত এক গরীব নাবিককে, এক জাহাজীকে। জাহাজীও তাকে ভালোবাসত।

কিন্তু সম্ভ্রান্তবংশের খান মরে গেলেও তার মেয়েকে এক অজ্ঞাতকুলশীল জাহাজীর সঙ্গে বিয়ে দেবে না।

তখন যুবক ঠিক করল দূর দেশে যাত্রা করবে, বড় বড় কীর্তি সাধন করে নামজাদা বীর হয়ে ফিরে আসবে। তাহলে খানের আর সাধ্যি হবে না তাকে ফিরিয়ে দেবার।
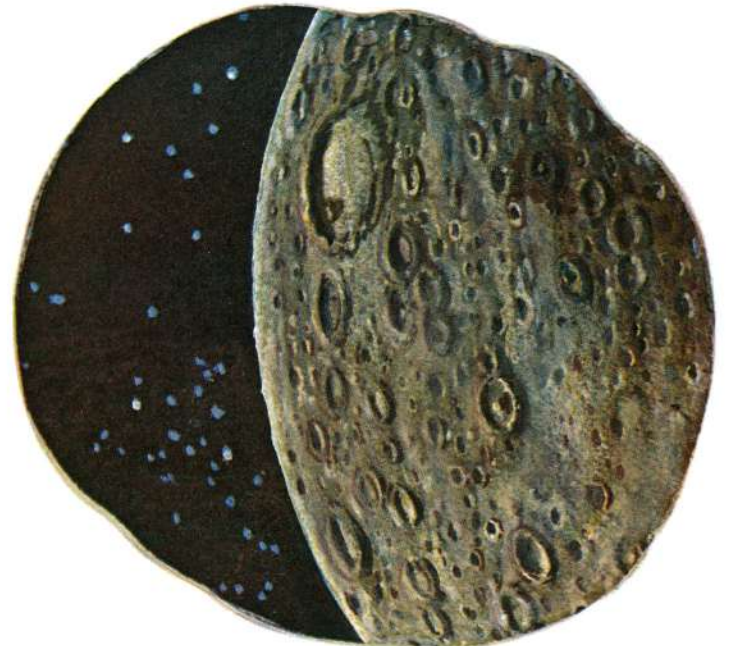
জাহাজী তার ভাবী বধূর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দূর দেশের উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রায় নামল। এদিকে সুন্দরী শশী তার জন্যে দিন গুনতে লাগল।

বহু কাল কেটে গেল, মনের মানুষটির কোন খোঁজখবর নেই। শশী অস্থির হয়ে পড়ল, রোজ রাতে সাগরতীরে বেরিয়ে এসে দেখে জাহাজী আসছে কিনা।

কিন্তু না, সে আর আসে না। কিছু ঘটল কিনা কে জানে? শশী কাঁদে, তার মন বিষাদে ভরে ওঠে।

বৃদ্ধ খান মারা গেল। জমকাল প্রাসাদে এখন রইল একা তার কন্যাটি।

রোজ রাতে সে তার বিয়ের সাজ পরে একটা মায়াতরীতে চেপে সখী তারকাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে আকাশপথে চলে বেড়ায়। ব্যথাতুর দৃষ্টিতে দূরের পানে তাকিয়ে দেখে, হারানো দয়িতের সন্ধান করে।

এই কারণে চাঁদ এমন ফেকাসে আর বিষণ্ণ।

আরেক প্রাচীন রূপকথায় চাঁদ হল এক রূপোলি মায়াদ্বীপ— নীল আকাশ-সাগরে ভাসছে। এই দ্বীপে বিচিত্র অধিবাসীদের বাস, তারা দেখতে মানুষের মতন নয়।

কিন্তু অধিকাংশ রূপকথাতেই চাঁদ হল এক জীবন্ত প্রাণী। আর সত্যিই ত, চাঁদের দিকে যখন তাকাও তখন মনে হয় যেন তার প্রসন্ন মুখটা তোমার দিকে চেয়ে আছে। চাঁদের বুকে যে কলঙ্কগুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে কিন্তু চোখ-নাক-মুখের বড়ই মিল!

রূপকথায় চাঁদ সব সময় ভালো, উদার, কখন-কখন বিষণ্ণ।

টেলিস্কোপের সাহায্যে লোকে চাঁদ ভালোমতো নিরীক্ষণ করতে পারল। কিন্তু মানুষের ইচ্ছে হল আরও বেশি করে তার সমস্ত খুঁটিনাটি, আকর্ষণীয় সব কিছু দেখে।

রকেটের সাহায্যে মানুষ তাই সরাসরি ওখানে, একেবারে চাঁদে পাঠাতে শুরু করল নানা রকম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। যন্ত্রগুলো তাদের কাচের চোখ দিয়ে চারপাশের সমস্ত কিছু নিরীক্ষণ করে, নিজের আশেপাশে যা যা দেখে টেলিভিশনের সাহায্যে তা আমাদের দেখাতে থাকে।

প্রথম প্রথম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো ছিল অনড়। চাঁদের যেখানে গিয়ে নামল সেখানেই বসে থাকত। কেবল 'মাথাটা' ঘোরাত। পরে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ররা আরও বেশি 'বুদ্ধিমান' যন্ত্রপাতি চাঁদে পাঠাতে লাগলেন। এই ধরনের সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মধ্যে এমন কিছু কিছু ছিল যেগুলো চাঁদে নামার পর লম্বা লোহার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এক ডেলা চন্দ্রমৃত্তিকা তুলে নিয়ে সঙ্গের ছোট রকেটের ভেতরে পুরে ফেলে এবং তা নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই ভাবে বিজ্ঞানীরা, সোজা ভাষায় বলা যেতে পারে, 'বাড়ি থেকে না বেরিয়েই' 'চাঁদের কণা' হাতে পেয়ে গেলেন। চাকা ও ইঞ্জিন লাগানো কিছু চন্দ্র-অভিযানকারী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও আমাদের ছিল। এরকম চন্দ্রযান 'লুনোখোদ' এলাকা পরিদর্শন করে নিজের চারপাশে যা যা দেখতে পায় টেলিভিশন মারফত সে সব জিনিসের ছবি পৃথিবীর মানুষকে পাঠায়। মানুষ পৃথিবী থেকে রেডিওর সাহায্যে এই চন্দ্রযান নিয়ন্ত্রণ করে। রেডিও-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাকে ডাইনে বাঁয়ে যখন যেদিকে পরিচালনা করে যানটি সেই দিকে চলে। বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ররা পৃথিবীর বুকে স্বাভাবিক তাপমাত্রাযুক্ত ঘরে, আরামদায়ক চেয়ারে বসে টেলিভিশনের পর্দায় ছবি দেখেন, তাঁদের মনে হয় যেন তাঁরা নিজেরাই কোন যানে চেপে চাঁদের বুকে চলেছেন। এমনকি তাঁরা ইচ্ছেমতো চন্দ্রযানকে থামিয়ে তার 'হাত দিয়ে' চন্দ্রমৃত্তিকা স্পর্শ করিয়ে জানতে পারেন সে মাটি শক্ত না ঝুরঝুরে, বার করতে পারেন তার উপাদান। পুরো ব্যাপারটা ছিল দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক, মানুষের পক্ষে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যকর আর সম্পূর্ণ নিরাপদ।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো মানুষকে বহু নতুন নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকানরা চাঁদে তাদের নভশ্চারীদের পাঠায়। খুবই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল তাদের। দীর্ঘ বছর ধরে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে
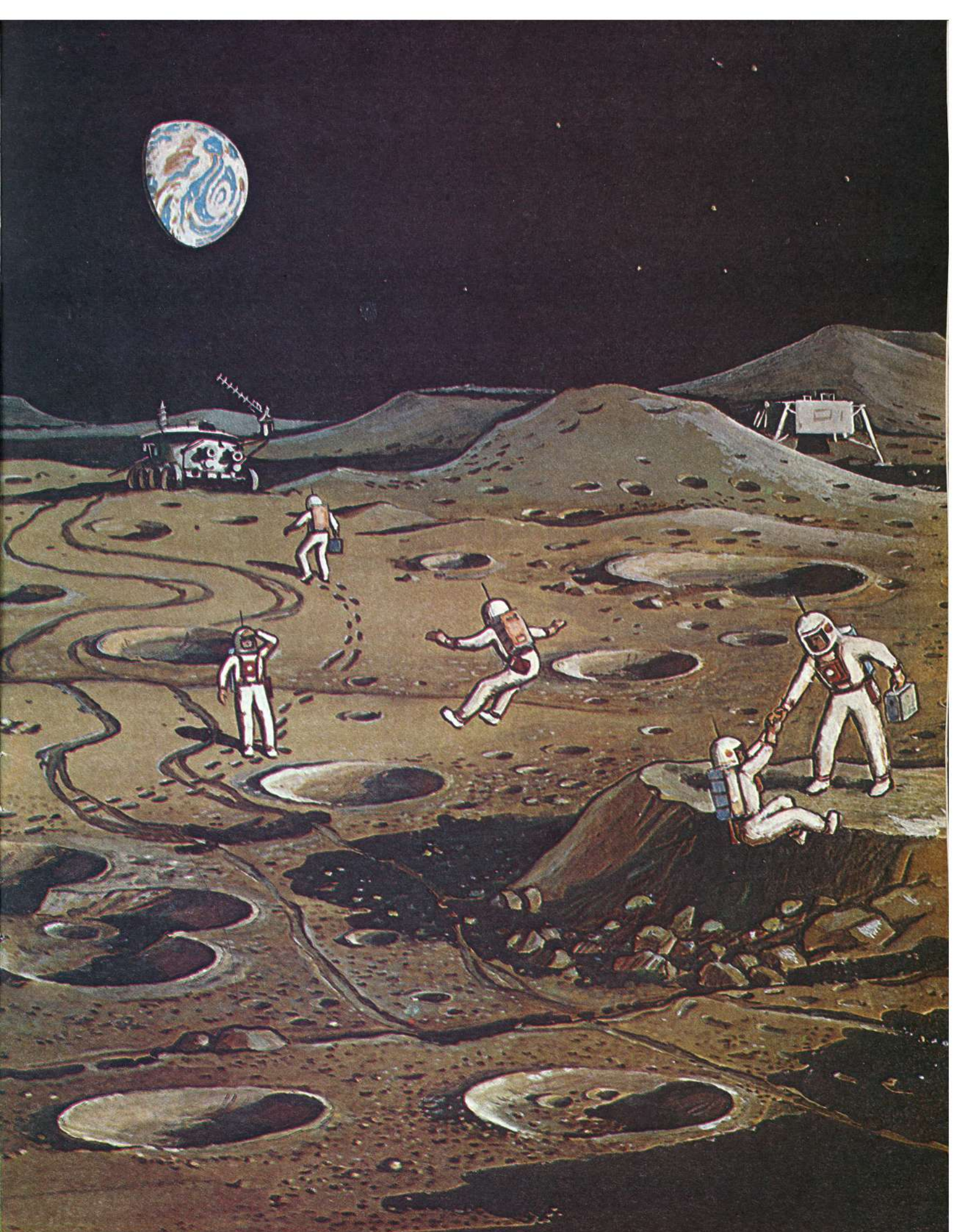
হয়। তারা দুডজন বিশাল বিশাল রকেট তৈরি করল। প্রত্যেকটি তিরিশতলা বাড়ি সমান উঁচু। এই রকেটগুলোর মাথায় ওপর চাপানো হল বিরাট বিরাট 'অ্যাপলো' মহাকাশযান। পৃথিবীর চারধারে অনেকবার সেগুলো পরীক্ষামূলক ভাবে উড়ল। তারপর উড়ল চাঁদের দিকে।

চাঁদের বুকে মানুষ প্রথম পদার্পণ করল ১৯৬৯ সালে। প্রথম যাঁরা পদার্পণ করলেন তাঁরা হলেন মার্কিন নভশ্চারী নিল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অল্‌ড্রিন। মোট বারোজন আমেরিকান নভশ্চারী চাঁদে পাড়ি দেন। তাঁদের মধ্যে শেষোক্তজন চাঁদে নেমে হালকা যানে চেপে চাঁদের জমির ওপর দিয়ে পর্যন্ত গেছেন।

মার্কিন নভশ্চারীরা চাঁদ থেকে চন্দ্রমৃত্তিকার বহু নিদর্শন ও আলোকচিত্র নিয়ে আসেন। তার চেয়ে বড় কথা, তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। তাঁদের যাত্রার পর এবং আমাদের চন্দ্রযান 'লুনোখোদ'-এর কাজের পর এখন আমি তুমি, আমরাও চাঁদে যাত্রার কথা কল্পনা করতে পারি।

দুদিনের মধ্যে রকেট আমাদের যথাস্থানে পৌঁছে দিল।

এখন আমরা চাঁদে! আমরা রকেট থেকে বেরিয়ে আসি। আমাদের পরনে স্পেস্‌স্যুট। এছাড়া এখানে অচল। চাঁদে বায়ু নেই, এখানে নিশ্বাস নেওয়া অসম্ভব। কিন্তু স্পেস্‌স্যুটের ভেতরে বায়ু আছে।

চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে ছোট, তাই তার আকর্ষণশক্তিও তুলনায় দুর্বল। এখানে সমস্ত জিনিস ছয় ভাগ হালকা হয়ে যায়। তুমি তোমার বন্ধুকে এক হাতে তুলে ধরতে পার — যেন তুলোয় ঠাসা একটা খেলার পুতুল।

আমরা এখানে এত হালকা যে অনায়াসে ইয়া চওড়া চওড়া খানাখন্দ লাফিয়ে পেরোতে পারি, এক লাফে উঁচু শিলার খাঁজে উঠে পড়তে পারি। মনে হয় অদৃশ্য কে যেন সর্বক্ষণ আমাদের সাহায্য করছে।

এখানে পড়ে যাওয়াটাও পৃথিবীর মাটিতে পড়ার মতো নয়। পড়ার সময় তুমি নামবে ধীরে ধীরে — মনে হবে যেন জলে নামছ।

নিল আর্মস্ট্রং বলেন যে অসাবধানতাবশত কেউ যদি মুখ থুবড়ে পড়ে যায় তাহলেও চোট পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। উঠতেও কোন অসুবিধা নেই — স্রেফ দুহাতে তলাকার মাটি ঠেলে দিলেই হল। তিনি বলেন যে হালকা হয়ে যাওয়ার ফলে অনেক সময় তাঁকে অসুবিধার মধ্যেও পড়তে হয়।

হালকা মানুষের পা হালকা ভাবে জমির সঙ্গে চেপে থাকে, তাই পিছলে যায় — যেমন হয় বরফের ওপরে। যদি দাঁড়িয়ে থাক, তারপর পা ফেলে চলতে যাও তাহলে পা প্রথমে পিছলে যাবে। তাই ধীরে ধীরে, ছোট ছোট পা ফেলে গতিবেগ নিতে হয়। এর পর যখন দ্রুত হাঁটতে থাক তখনও চট করে থামা বা হঠাৎ মোড় নেওয়া সম্ভব নয়। পা পিছলে যাবে — হড়কে চলে যাবে। আগে থেকে ধীরে ধীরে গতিবেগ কমিয়ে আনতে হয়।

চাঁদে সব সময় পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। যত চিৎকারই কর না কেন কেউ শুনতে পাবে না। পৃথিবীতে শব্দ বায়ু মারফত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। চাঁদে বায়ু নেই। যদি একেবারে কানের কাছেও কেউ ঘণ্টা বাজায় কিছুই শুনতে পাবে না। মনে হবে যেন লেপের ওপর ঘা মারছে।

এখানে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে পার কেবল রেডিওর মারফত কিংবা মাথা খাটিয়ে হাতের নানা রকম ইশারা-ইঙ্গিতে।

কী দেখা যায় চারপাশে?

এখানে নেই কোন গাছপালা, নেই কোন ঘাস। মরুভূমি। এবড়োখেবড়ো জমি। যেন নানা রকম ঢেলা আর পাথর এখানে স্তূপাকার করে ফেলা হয়েছে, তারপর খানিকটা সমান করে দিয়ে ওপরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ধূসর-খয়েরি রঙের ধুলো। সর্বত্র পাথর আর গর্ত। পায়ের নীচে ঠিকমতো দেখে যদি না চল ত হোঁচট খাবে।

চাঁদের গর্তগুলো প্রায়ই গোল গোল, ধারগুলো সামান্য ওঠা-ওঠা। যুদ্ধের সময় গোলা ফেটে মাটি ওলট-পালট হয়ে গিয়ে যেমন গর্ত হয় অনেকটা সেরকম দেখতে।

বড় বড় গহ্বরের মুখের চারপাশে গোল হয়ে আছে টিলার সারি।

সবচেয়ে বড় গহ্বরগুলোর তলা — গোল, চেপ্‌টা চত্বরের মতো। তাই সেগুলোকে দেখলে মনে হয় যেন গ্যালারি ঘেরা বিশাল বিশাল স্টেডিয়াম, কিংবা বিরাট বিরাট খোলা সার্কাসের মাঠ।

চাঁদের আকাশ আদৌ পৃথিবীর আকাশের মতন নয়। সে আকাশ নীল নয়, কালো। দিনে-রাতে একই রকম কালো। কেবল রাতে তারায় ছাওয়া। দিনের বেলায়ও তাদের নিরীক্ষণ করা যায়, তবে সূর্য থেকে বা চাঁদের আলোকিত প্রান্তর থেকে তোমার চোখ আড়াল করে রাখতে হবে।

সূর্য ছাড়াও কালো আকাশে ঝুলছে পৃথিবী। নীল, প্রকাণ্ড,

মনে হয় যেন সাদা কিছু দিয়ে আগাগোড়া মাখানো। এগুলো হল আমাদের মেঘ।

মজার ব্যাপার এই যে আকাশে সূর্য চলছে, কিন্তু পৃথিবী এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। এমন হওয়ার কারণ এই যে চাঁদ পৃথিবীকে সব সময় দেখছে এক দিক থেকে, যেমন দড়ি বাঁধা কুকুরছানাটা বাচ্চা মেয়েটির চারধারে ছোটার সময় তাকে দেখতে পেয়েছিল। তোমাদের মনে আছে ত?

সূর্য পৃথিবীর ওপর আলো ফেলে এক দিক থেকে। এইজন্য পৃথিবীকে দেখায় কাস্তের মতন। আকাশে সূর্য পৃথিবীর যত কাছাকাছি আসে কাস্তেটা তত সরু হয়ে আসে। আবার সূর্য যখন পৃথিবীর পাশ দিয়ে যায় তখন পৃথিবীকে দেখায় একটা ছোট রুপোলি বলয়ের মতো।

চাঁদের আকাশে সূর্য খুব ধীরে ধীরে ভেসে চলে। এখানে একদিন যেতে পুরো দু'সপ্তাহ কেটে যায়।

দিন এত দীর্ঘ বলে সূর্যের তাপে চাঁদের পাথর এত গনগনে গরম হয়ে ওঠার সময় পায় যে তার ওপরে খাবার পর্যন্ত রান্না করা যায়, যেমন তোমরা কর উনুনে। বেশ সুবিধার। তাই না?

তবে হ্যাঁ, হুঁশিয়ার থাকবে যখন রাত শুরু হচ্ছে। রাতও এখানে স্থায়ী হচ্ছে দু'সপ্তাহ। চারপাশের শিলা চটপট জুড়িয়ে যায়। কড়া হিম পড়ে। কয়েক দিনের মধ্যে তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের ১৫০ ডিগ্রী পর্যন্ত নীচে নেমে যায়! এদিকে সূর্য কিন্তু শিগগির উঠছে না! এমন 'আবহাওয়ায়' ঘরে চুল্লির পাশে বসে থাকাই ভালো। চাঁদে থাকাটা আরামের কিছু ত নয়ই বরং ভয়ের।

গ্রহ কী?

সন্ধ্যা। সূর্য একেবারে দিগন্তে নেমে এসেছে। ঘনিয়ে আসছে অল্প-অল্প অন্ধকার। কিন্তু আকাশে এখনও বেশ আলো আছে। নীল-গোলাপী আভা ধরেছে আকাশে।

তারপর হঠাৎ তুমি দেখতে পাবে আকাশে, খানিকটা বাঁয়ে, সূর্যের ওপরে অলক্ষ্যে জ্বলে উঠল একটা ছোট্ট রূপোলি তারা। তারাটা একটু একটু করে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অন্য তারাদের এখনও আবির্ভাব ঘটে নি। আবির্ভাব ঘটবেই বা কী করে! এখনও যে দিনের আলো আছে। অথচ এই

তারাটা একা জ্বলছে একটা বাতির মতো, এমনকি মিটমিটও করছে না।

গোধূলি আসতে না আসতে তারাটা এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে সে নীচে নামতে থাকে, দেখে মনে হয় যেন তার ভয় পাছে দিগন্তের ওপারে অপসৃত সূর্য থেকে সে পিছিয়ে পড়ে। পুরোপুরি অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে সারা আকাশে যখন হাজার হাজার তারা ঝলকে ওঠে তখন আমাদের এই সুন্দরীটি 'পৃথিবীর ও প্রান্তে' লুকিয়ে পড়ে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় আবার দীপ্তি পায়।

এই ভাবে কাটবে এক মাস, দু'মাস। তারপর এই তারার দীপ্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসতে থাকবে, শেষকালে তাকে আর চোখেই পড়বে না; কিন্তু কিছু দিন বাদে আবার আকাশে জ্বলজ্বল করতে থাকবে সকালে, প্রত্যূষের গোলাপী কিরণের মাঝখানে। সে আকাশ পথে উঠতে থাকবে — যেন যে-সূর্য শিগগিরই উঠতে চলেছে তাকে পথ নির্দেশ করছে। সমস্ত তারা অনেক আগে নিভে গেছে, কিন্তু এটা এখনও জ্বলছে। সূর্য যখন আরও একটু ওপরে ওঠে একমাত্র তখনই সে নিঃশেষে নিভে যায়।

রূপোলি রঙের এই সুন্দরী তারাটা আসলে কী? আর সব তারাদের চেয়ে এত বেশি উজ্জ্বলই বা সে কেন? কখনও সূর্যকে পথ দেখিয়ে তার আগে আগে কখনও বা সূর্যের পিছে পিছে আকাশ পথে সে বিচরণ করছে কেন?
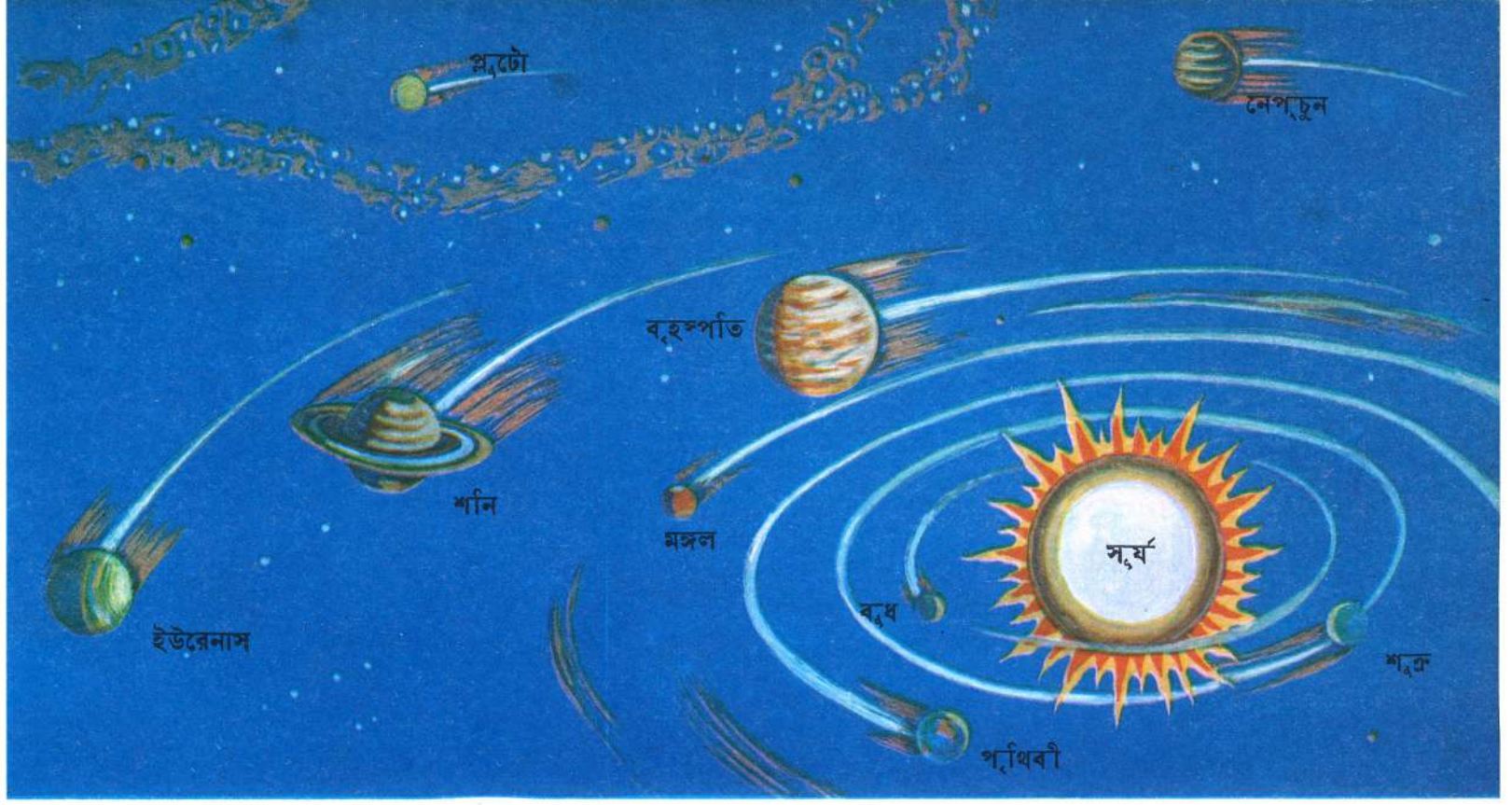
হাজার হাজার বছর ধরে লোকে মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখছে, তাকে কখনও বলে থাকে সন্ধ্যাতারা, কখনও বা শুকতারা।

প্রাচীন গ্রীকেরা তাদের সৌন্দর্যদেবীর নামে নাম দিয়েছিল ভেনাস, এর সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর নানা কাহিনীও রচনা করেছিল তারা। তাদের মনে হয়েছিল এই সুন্দরী কন্যাটি তুষারধবল অশ্বচালিত রুপোর রথে আকাশ পথে ভ্রমণ করেন।

আচ্ছা আসলে এই শুক্র বা ভেনাস কী?

শুক্র বা ভেনাস কোন তারা নয়, আসলে একটি গ্রহ। গ্রীক ভাষায় গ্রহকে বলা হয় 'প্ল্যানেট', যার অর্থ হল ভ্রমণশীল।

সমস্ত তারা তাদের নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু কয়েকটা তারা আছে যেগুলো ধীরে ধীরে 'এক নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আরেক নক্ষত্রপুঞ্জে ভ্রমণ করে'। প্রতিবেশী তারাদের দিয়ে তাদের স্থান চিহ্নিত করে কয়েকদিন বাদে যদি যাচাই করে দেখ তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করবে যে তোমার তারাটা 'সটকে পড়েছে'।

ভ্রমণশীল তারা — গ্রহ — সাদা চোখে লোকে দেখতে পায় পাঁচটি। টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা যায় আরও বেশি।

আচ্ছা, এসো, এদের পরিচয় নেওয়া যাক।

কিন্তু এর জন্য আমাদের যাত্রা করতে হয় আরও দূরে মহাকাশে।

কল্পনা করা যাক, আমরা বিরাট এক রকেটে চড়ে সূর্য থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছি। এত দূরে যে সূর্য এখন আর আমাদের কাছে একটা হলুদ থালার মতো দেখাচ্ছে না, দেখাচ্ছে স্রেফ একটা খুব জ্বলজ্বলে তারার মতো।

এখন দেখ, এই উজ্জ্বল তারাটা মহাকাশে আরও দূরের অন্যান্য তারার মাঝখানে মন্থরগতিতে স্বমহিমায় ভাসতে ভাসতে চলেছে।

এবারে মন দিয়ে সূর্যটাকে একটু দেখা যাক। তার ধারেকাছে আরও কয়েকটি খুব খুদে খুদে তারা লক্ষ করা যায়। চারদিক থেকে সূর্যকে ঘিরে ধরে ঐ তারাগুলো তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

এবারে আমরা টেলিস্কোপ দিয়ে ওগুলোকে দেখি। প্রতিটি তারা চোখে পড়ছে এককেটা ফালির আকারে, যেন এককেটা খুদে চাঁদ। তার কারণ সমস্ত তারার মতো এরা অগ্নিগোলক নয়, এরা হল অন্ধকার, কঠিন, পাথুরে গোলা — সূর্যের আলোয় আলোকিত মাত্র।

তাদের মধ্যে কতকগুলো সূর্যের অনেকটা কাছে, কতকগুলো তার থেকে দূরে। আমাদের পৃথিবীও তাদেরই একটি।

গ্রহরা নিজেরা আলো দেয় না। সূর্য জ্বলে বলেই ওরা আলো দেয়। ওরা চাঁদের মতন।

সূর্য নিভে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সব গ্রহও নিভে যাবে।

দেখা যাক গ্রহরা কী ভাবে ঘুরছে। সব গ্রহই ঘুরপাক খাচ্ছে সূর্যের চারধারে। কিন্তু এখান থেকে, দূর থেকে দেখে মনে হয় বুঝি বড় বেশি ঢিমে তালে চলছে; এমনকি মনে হতে পারে বুঝি দাঁড়িয়েই আছে। প্রতিটি গ্রহ বছরে কী ধরনের পথ যাত্রা করে তার একটা ছবি আমরা এঁকেছি।

'চটপটে' গ্রহ বুধ বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চারবার। শুক্রগ্রহ তুলনায় একটু বেশি 'ধীরস্থির'। ঐ সময়ের মধ্যে সে সূর্যের চারদিক ঘুরে আসছে মাত্র দু'বার। পৃথিবী — একবার। 'অলস প্রকৃতির' মঙ্গল মোটে আধপাক ঘুরতে পারে। বাকিরা তার চেয়েও কম।

গ্রহে গ্রহে কখনই সঙ্ঘর্ষ লাগবে না। মহাকাশে তাদের প্রত্যেকের যার যার যাত্রাপথ আছে, আছে নিজস্ব গতিপথ — যাকে বলে 'কক্ষপথ'।

কোন গ্রহই কখনও সূর্যকে ছেড়ে যাবে না। তাদের সকলেরই চিরকালের জন্য সূর্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা আছে। তারা সকলে মিলেমিশে একটা সুখী পরিবার। এই পরিবারের নিয়মশৃঙ্খলা আদর্শস্থানীয়। সূর্য হল পরিবারের প্রধান। এই কারণে গ্রহ-পরিবারকে বলা হয় সৌর জগৎ।

এবারে ফিরে আসা যাক। চলো যাই

গ্রহদের একেবারে 'গহনে'। এসো, আমাদের সাধের এই পৃথিবীতে নেমে আসি, যেখান থেকে দেখি অন্যান্য গ্রহদের। তাদের মধ্যে কোনটি পৃথিবীর কাছাকাছি, কোনটি বা দূরে। কোনটি সূর্য যে দিকে আছে সেই দিকে, কোনটি বা বিপরীত দিকে।

কিন্তু সকলেই অনেক দূরে। এই কারণে আকাশে কোন গ্রহকেই চাঁদের মতো গোলাকারে দেখা যায় না। তাদের সকলকে দেখা যায় কেবল উজ্জ্বল বিন্দুরূপে। তাই তারার সঙ্গে তাদের গুলিয়ে ফেলা খুবই সম্ভব।

বলাই বাহুল্য সবচেয়ে ভালো দেখা যায় পৃথিবীর কাছাকাছি গ্রহগুলোকে — বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনি গ্রহকে।

ভালো বাইনোকুলার দিয়ে শুক্রগ্রহকে দেখা যায় একরত্তি কাস্তের মতন, অনেকটা চাঁদের কাস্তের মতন। আর তখনই বুঝতে বাকি থাকে না যে এটা কোন তারা নয় — এটা হল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন গোলা, যার একটা দিক সূর্যের আলোয় আলোকিত।

বুধকে দেখতে পাওয়া আরও কঠিন। তার গতিপথ সূর্যের বড় কাছাকাছি। আর সূর্য যেহেতু উজ্জ্বল সেই কারণে বুধকে চোখে পড়া কঠিন। কেবল মাঝে মাঝে, সূর্য যখন দিগন্তে অস্ত যায়, তখন গোধূলির কিরণে কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায় একটা ছোট্ট জ্বলজ্বলে তারা— এটাই বুধ। সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সূর্যের পেছন পেছন চলেছে, যেন তার ভয় পাছে সূর্যকে না ধরতে পারে; তারপর দেখতে দেখতে দিগন্তের ওপারে মিলিয়ে যায়। কখন কখন শুক্রের মতো বুধকেও সকালবেলায় দেখা যায়। শিগগিরই সূর্য যেখানে ওঠার কথা, দিগন্তের ওপার থেকে লাফিয়ে সে চলে আসে সেই জায়গায়, তারপর খানিকটা ওপরে উঠে যায়, কিন্তু আধঘণ্টা বাদেই ঊষার কিরণে মিলিয়ে যায়।

বুধ কখনও 'সুস্থির হয়ে বসে থাকতে' পারে না। সমস্ত গ্রহের মধ্যে সে সবচেয়ে দ্রুতগামী, সবচেয়ে ছটফটে — কখনও এখানে, কখনও ওখানে; এই তাকে দেখা যায়, এই দেখা যায় না।

প্রাচীন গ্রীকেরা এই গ্রহটির নাম দিয়েছিল মার্কারি। তাদের কথায়, কারও যদি কোথাও যাবার কোন তাড়া থাকে তাহলে তাকে মার্কারির কাছে শিক্ষা নেওয়া উচিত। এই কারণে ভ্রমণকারী ও পথযাত্রীরা সকলে মার্কারিকে তাদের গুরু ও পৃষ্ঠপোষক বলে গণ্য করত। সওদাগরেরাও। সওদাগরদের ত সবসময়ই তাড়া থাকত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পসরা

যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার। যত তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবে তত তাড়াতাড়ি বেচতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি টাকা পেয়ে যাবে। তাই মার্কারি বাণিজ্যেরও পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়াল।

মঙ্গলকে রঙ দেখে অন্যান্য তারার চেয়ে আলাদা করে চেনা যায়। সাদা-নীলচে তারাদের মধ্যে মঙ্গলকে মনে হয় যেন উজ্জ্বল কমলা রঙের। স্বচক্ষে যাচাই করে দেখতে হলে প্রতিবেশী তারাদের দিয়ে আকাশে তার অবস্থান মনে করে রাখো। কয়েক দিন বাদে লক্ষ করবে কী ভাবে সে সরে গেছে।

রঙের দিক থেকে মঙ্গল আগুনের মতো, ধুনির অগ্নিশিখার মতো। এই কমলারঙের গ্রহটির দিকে তাকিয়ে মানুষের মনে হত যেন অগ্নিকান্ড, যে অগ্নিকান্ড যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে।

প্রাচীন গ্রীকেরা এই গ্রহটির নাম দিয়েছিল মার্স্। মার্স্‌কে তারা ভয় করত। তারা মনে করত আকাশে তার আবির্ভাব মানেই মানুষের ওপর যুদ্ধ এবং অন্যান্য দুর্বিপাক ঘনিয়ে আসা।

কিন্তু সেনানায়করা মার্স্‌কে তাদের পৃষ্ঠপোষক বলে গণ্য করতেন, তাঁরা ভরসা করতেন যে মার্স্ তাঁদের শত্রুজয়ে সাহায্য করবেন।

মার্স্ বা মঙ্গলকে প্রতি বছর দেখা যায় না। সূর্যের চারধার ঘুরে আসতে পৃথিবীর দ্বিগুণ সময় লাগে তার। প্রায়ই এমন হয় যে আমাদের গ্রহ পৃথিবী সূর্যের যে দিকটায় আছে, মঙ্গল আছে তার উলটো দিকে।

সেক্ষেত্রে মঙ্গলকে দেখা যায় না। উজ্জ্বল সূর্যালোক বিঘ্ন ঘটায়। দিনের বেলায় নীল আকাশে সূর্যের পাশে কি আর উজ্জ্বল তারাকেও চেনা যায়? অবশ্যই, যায় না। কিন্তু মঙ্গল যখন আমাদের দিকটায় থাকে তখন রাতের বেলায় তাকে চমৎকার দেখা যায়। কখন কখন সে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে আসতে থাকে, তখন সে হয়ে উঠতে থাকে বড় আর জ্বলজ্বলে।

মঙ্গলকে দেখা যায় কেবল রাতে। দিনের বেলায় সূর্য যে পথ ধরে যায় আকাশের সেই অংশে তাকে খুঁজতে হয়।

আকাশের এই অংশেই রাতের বেলায় বৃহস্পতিকেও দেখা যায়। বৃহস্পতি চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সাদা তারা। সত্যিকারের তারাদের সঙ্গে তার তফাত হল এই যে সমস্ত গ্রহের মতো সেও মিটমিট না করে লণ্ঠনের মতো সমান ভাবে জ্বলে।

জোরাল বাইনোকুলার দিয়ে বৃহস্পতিকে দেখলে বেশ মজা পাওয়া যাবে। তখন তার দু'পাশে চোখে পড়বে সারি বাঁধা চারটি ছোট ছোট তারা — এত ছোট যে প্রায় নজরেই পড়ে না। মনে করে রেখো ওরা কোথায় আছে এবং কাল, এমনকি সম্ভব হলে আজই কয়েক ঘণ্টা বাদে তাদের দেখার চেষ্টা কর। দেখতে পাবে তারাগুলো জায়গা বদল করেছে। যেটা ছিল বৃহস্পতির বাঁয়ে সেটা এখন তার ডাইনে। যেটা ছিল কাছে সেটা এখন দূরে সরে গেছে। এরা হল বৃহস্পতির উপগ্রহ, তার চাঁদ। ওরা বৃহস্পতির চারধারে ঘোরে। যতবার তুমি বৃহস্পতিকে দেখ ততবারই ওদের দেখতে পাবে নতুন জায়গায়।
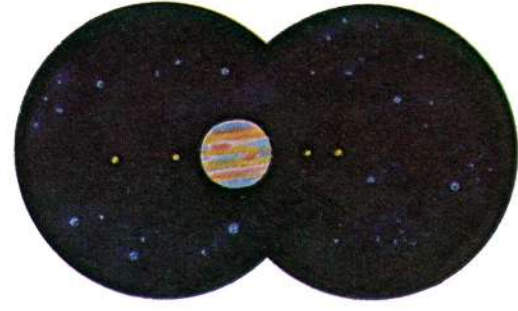
বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছাকাছি যেটা আছে সেটা ঘোরে সবচেয়ে বেশি জোরে।

বৃহস্পতি আর তার চন্দ্রমন্ডলী নিয়ে একটা ছোটখাটো 'সৌরজগৎ'-এর মতন। তাই বাইনোকুলার দিয়ে যখন বৃহস্পতিকে দেখ তখন মাঝখানে সূর্যসমেত আমাদের গ্রহপরিবারকে দিব্যি ধারণা করা যায়।

শনিও একটা জ্বলজ্বলে সাদা তারা। তবে বৃহস্পতির চেয়ে কিছুটা ম্লান। এটা সবচেয়ে সুন্দর গ্রহ। কেন, তা পরে জানতে পারবে।

সমস্ত গ্রহকে একসঙ্গে জড় করে যদি বিরাট একটা রুলারের ওপর সার দিয়ে রাখা যেত তাহলে আমরা দেখতে পেতাম ওদের প্রত্যেকের আকার একেক রকম। কোন কোনটি আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ছোট, কোনটি বা অনেক বড়।

সবচেয়ে ছোট গ্রহ বুধ। সবচেয়ে বড় — বৃহস্পতি। কিন্তু এই বৃহস্পতি পর্যন্ত সূর্যের চেয়ে বহুগুণ ছোট। সূর্য আমাদের ছবিতে আঁটবেই না।

তুলনার খাতিরে আমরা পাশে চাঁদকেও এঁকেছি। চাঁদ বুধের চেয়েও ছোট।

দেখতে পাচ্ছ গ্রহগুলো সব কত ভিন্ন ভিন্ন?

আচ্ছা, তোমরা কি মনে কর বড় হোক ছোট হোক যে-কোন গ্রহে বাস করা একই কথা?

নাকি মনে কর বড় গ্রহে বাস করা ভালো? সেখানে বেশি জায়গা আছে বলে? নাকি ছোট গ্রহেই ভালো? বেশ তাড়াতাড়ি 'ভূপ্রদক্ষিণ' করা যায়?

দাঁড়াও, আগে ভাগে কোন সিদ্ধান্ত করে বসো না। ব্যাপারটা যেমন মনে হচ্ছে আসলে মোটেই তত সোজা নয়।

গ্রহ যত বড় তত জোরে সমস্ত কিছুকে সে টানে। এই কারণে বড় গ্রহে যে-কোন জিনিসকে মাটি থেকে তোলা বেশি কঠিন। জিনিস অনেক বেশি ভারী মনে হয়।

যেমন ধর বৃহস্পতির আকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি। বৃহস্পতিতে আমরা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই
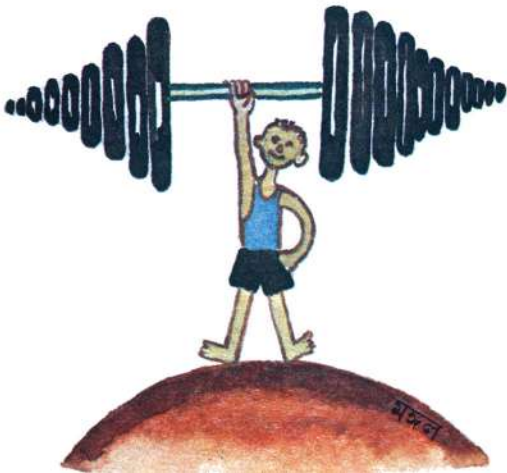
থাকতে পারতাম না। আমাদের মনে হত আমরা প্রত্যেকে যেন কয়েক কিলোগ্রাম করে স্যুটকেসের চাপে আছি।

বলাই বাহুল্য, অমন চাপে পড়ে আমাদের পা বেঁকে যাবে।

বৃহস্পতির টান যে কেবল আমাদের পক্ষেই সহ্য করা অসম্ভব তা নয়। ইটের পাকা দালান পর্যন্ত বৃহস্পতিতে ধসে পড়ে যাবে। যে ইটের ভিতের ওপর দালান দাঁড়িয়ে থাকে তা পিষে গুঁড়িয়ে যাবে, যেহেতু বৃহস্পতিতে পাঁচতলা দালানের ওজন হবে পনেরো তলার সমান।

বৃহস্পতিতে ডিজেল ট্রেনের ভারে রেল লাইন দুমড়ে মুচড়ে যাবে, এরোপ্লেনের ডানা ভেঙে পড়ে যাবে, বাস-এর স্প্রিং আর চাকা ফেটে চুরমার হয়ে যাবে।

তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, বড় গ্রহে বাস করা অত সহজ নয়। সেখানে দরকার 'ফেরোকংক্রীটের' মানুষ, 'ইস্পাতের' গাছপালা আর 'পাথরের' জন্তুজানোয়ার।

আচ্ছা, ঠিক আছে, তাই যদি হয় তাহলে ত ছোট গ্রহগুলোতে বাস করা পরম সুখের বলতে হবে। ছোট গ্রহের টান দুর্বল। সব জিনিসই সেখানে হয়ে যায় হালকা, মনে হয় যেন গ্যাস-বেলুন অবলম্বন করে আছে। সেখানে হাঁটা সহজ, দ্রুত ছোটা যায়, অনেক উঁচুতে লাফানো যায়। মনে আছে চাঁদের কথা?

দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত তাড়াতাড়ি খুশি হয়ে কাজ নেই।

ছোট গ্রহে মানুষের ওজন যদি কম হয় তাহলে ইট পাথর এবং অন্যান্য জিনিসেরও ত ওজন কম হবে, তাই না? ছোট গ্রহ জল এবং বাতাসও খুব কম টানে।

তোমরা ভুলে যাও নি যে পৃথিবী বায়ুর 'প্রলেপ' লাগানো? কিন্তু ভেবে দেখেছ কি এই বায়ু কেন পৃথিবীর গায়ে লেগে থাকে? এই দেখ না কেন একটা ফুটবলের গায়ে যদি তামাকের ধোঁয়ার 'প্রলেপ' লাগাতে যাও তাহলে ধোঁয়া সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুও ত ধোঁয়ার মতোই। সেও ছড়িয়ে পড়তে চায়, পৃথিবীর ওপর থেকে ছড়িয়ে চতুর্দিকে চলে যেতে চায়। কিন্তু যায় না কেন? তার একমাত্র কারণ এই যে পৃথিবীর শক্তি আছে, পৃথিবী তার আপন জোরে বাতাস টানে, তাকে নিজের কাছে ধরে রাখে। কিন্তু পৃথিবী একটু দুর্বল হয়ে গেলেই আর দেখতে হচ্ছে না — বায়ু সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে, যেমন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তামাকের ধোঁয়া।

সুতরাং ছোট গ্রহে বায়ুর অবস্থাটা রীতিমতো শোচনীয় দাঁড়াচ্ছে। ছোট গ্রহগুলোর বায়ুকে ধরে রাখার মতো যথেষ্ট

শক্তি নেই। বায়ু একটু একটু করে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

এমনকি মঙ্গল গ্রহেও পৃথিবীর তুলনায় বায়ু অনেক কম। বায়ু সেখানে একেবারে 'পাতলা', 'হালকা'।

বুধে বায়ু নেই বললেই চলে। আর চাঁদের কথা ত তোমরা জানই — সেখানে আদৌ বায়ু নেই। বহু কাল আগে চাঁদ তার সমস্ত বায়ু হারিয়েছে।

ছোট গ্রহগুলোতে বায়ুই একমাত্র সমস্যা নয়। সেখানে জলের অবস্থাও শোচনীয়। সমস্ত জল বাষ্প হয়ে উবে যায়। বিশেষত সূর্য যখন তাকে গরম করে। তখন জল হয়ে যায় বাষ্প, কুয়াশা, মেঘ। আর কুয়াশা ও মেঘ হল বায়ুরই অংশ। তাকে যদি শক্ত করে ধরে রাখা না যায় তাহলে মহাকাশে ছড়িয়ে হারিয়ে যায়।

এই কারণে ছোট গ্রহগুলোতে জলও প্রায় নেই।

মঙ্গলে জল এক আধ ফোঁটা আছে, কিন্তু চাঁদ একেবারে শুকনো খটখটে। চাঁদে এক ফোঁটাও জল নেই। এমনকি চাঁদে যদি বালতি করে জল বয়ে নিয়ে এসে তার পাথরের ওপর ঢালোও দেখতে দেখতে সেই জলের ডোবাটা শুকিয়ে উবে যাবে, বাষ্প ভেসে চলে যাবে মহাকাশে, সেখানে হাওয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে।

তাহলেই দেখ, যে কোন গ্রহে বাস করা এক কথা নয়। মোটকথা, দাঁড়াচ্ছে এই যে 'মাঝারি আকারের' গ্রহই বসবাসের সবচেয়ে উপযোগী। এই যেমন আমাদের পৃথিবী। অন্ততপক্ষে মঙ্গল।

কিন্তু হ্যাঁ, আমরা কিন্তু তাপের কথাটা এখনও ভেবে দেখি নি। গ্রহগুলো কিন্তু দল বেঁধে গোল হয়ে সূর্যের চারদিকে ঘোরে না। তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের কক্ষপথে ঘোরে: কোন কোনটা সূর্যের কাছাকাছি, কোন কোনটা অনেকটা দূরে।

সূর্য তার কিরণ দিয়ে গ্রহকে তাপিত করে। সূর্যের তাপ ছাড়া জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। যে কোন চুল্লির মতোই সূর্যও কাছ থেকে জোরাল তাপ দেয়, দূর থেকে — ক্ষীণ।

পৃথিবী যদি সূর্যের কাছাকাছি চলে আসত তাহলে সমুদ্র ত ডেকচির জলের মতো টগবগ করে ফুটতই, গাছপালাও গরমে জ্বলেপুড়ে যেত।

আবার পৃথিবী যদি সূর্য থেকে দূরে সরে যেত তাহলে এত ঠান্ডা হত যে সমস্ত সমুদ্রের তলা অবধি জমে যেত। পৃথিবীটাও পুরো ঢেকে যেত বরফে। এমনকি গ্রীষ্মকালেও গলত না।

তার মানে একেক গ্রহে একেক রকম 'আবহাওয়া'। কোনটাতে বেজায় গরম, কোনটাতে বা বেজায় ঠান্ডা। তাহলে 'লাগসই জায়গাটা' মাঝামাঝি কোথাও হবে নিশ্চয়।

দেখা গেছে একমাত্র পৃথিবীই হল সেই 'লাগসই জায়গা'। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী যে শুক্র, সেখানেও বেজায় গরম। আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে একমাত্র মঙ্গলে কোন রকমে বাস করা গেলেও যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও বেশ ঠান্ডা, মোটে আরাম পাওয়া যাবে না।

এসো, এবারে আরও কাছ থেকে গ্রহগুলোর পরিচয় নেওয়া যাক।

আকাশে চাঁদ যেমন দেখা যায় টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহগুলোকেও অনেকটা তেমনি দেখা যায়। উজ্জ্বল চক্র আর তার গায়ে কালো কালো দাগ। এরকম একেকটি কলঙ্ক আকারে পৃথিবীর পুরো একেকটি দেশের সমান। এই দেখ না, সবচেয়ে ছোট গ্রহ যে বুধ সেও একটা প্রকাণ্ড গোলক — এত বড় যে পায়ে হেঁটে এক বছরেও তার চারদিক ঘোরা যায় না।

বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপ দিয়ে কোন একটা গ্রহ দেখেন, দেখতে দেখতে তাঁরা হয়ত লক্ষ করলেন যে গ্রহের কলঙ্কের আকৃতি পালটাচ্ছে। তাঁরা বলেন এর মানে হল মেঘ। অর্থাৎ গ্রহের চারদিকে এসে জমেছে বায়ুস্তর আর তার সেই বায়ুস্তরের ভেতরে ভাসছে ধুলোবালি, কুয়াশা ও মেঘপুঞ্জ।

কিন্তু গ্রহের ওপরকার কলঙ্কগুলো যদি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর একই রকম থাকে তাহলে বুঝতে হবে মেঘ নয়, গ্রহেরই নিজস্ব কিছু। হয় বিশাল নীল সমুদ্র, নয়ত বিরাট নিবিড় অরণ্য কিংবা কালো কালো শৈলমালা।

বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপ দিয়ে আরও দেখতে থাকেন। কালো দাগগুলো যদি সমুদ্রই হয় তাহলে সূর্যকিরণে জলের অন্তত মাঝে মাঝে চিকচিক করার কথা। কিন্তু চিকচিক যদি না করে তাহলে বুঝতে হবে ওটা 'শুকনো' জায়গা — এই যেমন, বনজঙ্গল বা পাহাড়-পর্বত।

বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপ দিয়ে কেবল দেখেনই না, তাঁরা টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্রহের ছবিও তোলেন। টেলিস্কোপের ওপর নানারকম জটিল যন্ত্রপাতি লাগিয়ে সেগুলোর সাহায্যে গ্রহের তাপমাত্রা মাপেন, জানতে পারেন গ্রহের বায়ু কী দিয়ে গঠিত, গ্রহের পিঠ বালু, পাথর না উদ্ভিদ — কিসে ঢাকা।

বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এইভাবে গ্রহদের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেছেন। আমরা তাই অনায়াসে কল্পনায় যে কোন গ্রহে ভ্রমণের জন্য যাত্রা করতে পারি।

বুধগ্রহে নামা যায় কি?

এবারে আমাদের মহাকাশযান যাত্রা করল বুধের দিকে।

অমনিতে মনে হয় বুধ বুঝি ঘুরপাক খায় না। যেন সব সময় 'এক পাশ হয়ে' সূর্যের দিকে উড়ে চলেছে। কিন্তু এটা চোখের ভ্রম মাত্র। গ্রহটার কলঙ্কগুলো নিরীক্ষণ করে দেখ। সেগুলো আলোর দিক থেকে ছায়ার দিকে অল্প অল্প করে 'সটকে যাচ্ছে'। তার মানে খয়েরি রঙের এই গোলকটি, ধীরে ধীরে হলেও, ঘোরে ঠিকই।

বুধ চলে তাড়াতাড়ি। তিন মাসে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু নিজের অক্ষদণ্ডের চারদিকে ঘুরে ঘুরে সূর্যের কিরণে দেহের সমস্ত 'পাশগুলোকে' গরম করতে সে সময় নেয় পুরো ছয়টি মাস।

বোঝ কাণ্ড! বুধের দিন-রাত তার বছরের দ্বিগুণ! অর্থাৎ বুধে 'নববর্ষ' দিনে দু'বার উদ্‌যাপন করা যায়! এই ধর সকালে আর সন্ধ্যায়। তবে হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না: সকাল যদি ওখানে হয়, ধর, আমাদের এখানকার জানুয়ারীতে, ত 'সন্ধ্যা' এপ্রিলের আগে হচ্ছে না।

আজব গ্রহ বটে!

এই গ্রহের কোন্ জায়গায় তাহলে আমরা নামব?

এখান থেকে সূর্য খুবই কাছে। সূর্যকে দেখায় বিরাট। পৃথিবী থেকে যেমন দেখায় তার প্রায় তিন গুণ বড়। অসহ্য গরম। একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বুধের আলোকিত দিকটা একটা অগ্নিকুণ্ড বিশেষ — ৪০০ ডিগ্রী! এরকম 'গরম দিন' স্থায়ী হয় তিন মাস। এখানে আমাদের মহাকাশযান নামানোর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। জ্বলে পুড়ে যাব! এমন তাপমাত্রায় কাচ নরম হয়ে যায়, সীসে গলে যায়!

বুধে বহুকাল আগে সমস্ত জল ফুটে ভাপ হয়ে উবে গেছে, প্রায় সমস্ত বায়ু মহাকাশে মিলিয়ে গেছে। সেখানে কেবল শুকনো, নগ্ন পাথর। দিনের বেলায় এমন গনগনে যে পা ফেলামাত্র তোমার বুটজুতোয় আগুন ধরে যাবে।

এই একই সময় গ্রহের অন্য অংশে, তার ছায়াচ্ছন্ন দিকে সূচীভেদ্য কালো রাত। ভয়ঙ্কর ঠান্ডা। তাপমাত্রা সেখানে ১৫০ ডিগ্রী হিমাঙ্ক, এমনকি তার চেয়েও বেশি। সূর্য দিগন্তে অস্ত গেল, তারপর তিন মাস তার আর দেখা নেই। বুধের নিজস্ব চাঁদ পর্যন্ত নেই। তবে শুক্র গ্রহটি আমাদের আকাশে যেমন দেখায় বুধের আকাশে তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। কেবল এই শুক্রই থেকে-থেকে বুধের হিমজমাট শিলাগুলোকে রাতের বেলায় অল্পস্বল্প আলোকিত করে। আর যখন এই শুক্রও অস্ত যায় তখন বুধের বুকে নেমে আসে নিশ্ছিদ্র আঁধার।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই গ্রহে নিরাপদে অবতরণ করা সম্ভব। এমনকি মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে হাঁটাচলাও করা যায়। বলাই বাহুল্য, স্পেস্‌স্যুটে।
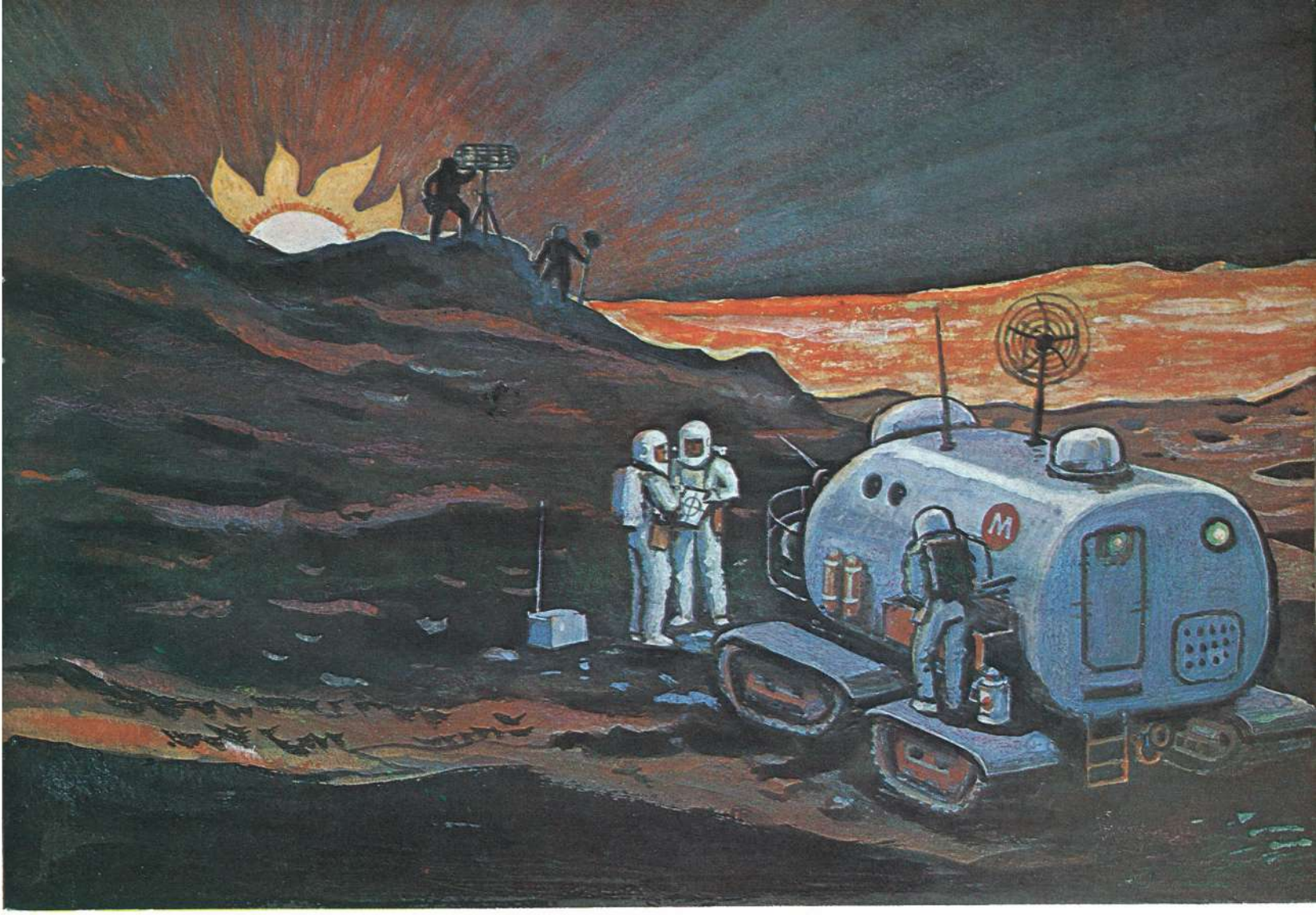
সূর্য অস্ত গেলে দিনের আলো রাতারাতি, সন্ধ্যার মধ্যে নৈশ হিমে পরিণত হতে পারে না। সম্ভবত ঠাণ্ডা হয় অল্প অল্প করে। এই বদল যখন ঘটতে থাকে তখন একটা সময় তাপমাত্রা নিশ্চয়ই এমন পর্যায়ে আসে যেটা আমাদের অভ্যস্ত, আমাদের কাছে প্রীতিকর — এই ধর, ১৫-২৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড।

তাই আমরা আমাদের মহাকাশযান নামাব আলো ও ছায়ার মাঝখানের সীমানায়, 'অগ্নিকুণ্ড' ও 'হিমঘরের' মাঝামাঝি ফালি জায়গায়, যেখানে এখন সন্ধ্যা। যেখানে এখন আর গরম নেই, তবে ঠাণ্ডাও এখনও পড়ে নি।

নেমে আমরা চারদিকে তাকিয়ে দেখি।

বুধের সঙ্গে চাঁদের অনেক মিল আছে। চাঁদের মতোই বুধেও ম্যাড়মেড়ে একঘেয়ে প্রান্তর, সেই সঙ্গে এখানে ওখানে গর্ত আর পাথর। সর্বত্র সেই এক রকম গোল গোল গহ্বর, চারধার টিলায় ঘেরা। কেবল আকাশ এখানে চাঁদের আকাশের মতো পুরোপুরি কালো নয়। এখানকার আকাশ কালো-বেগনী। হাজার হোক বুধে এখনও একটু-আধটু বাতাস রয়ে গেছে।

সূর্য এখন একেবারে দিগন্তে। টিলা আর শৈলচূড়াগুলো থেকে লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। ছায়ায় পাথর জুড়িয়ে আসছে। ছোঁয়া যায়। শিলাগুলো থেকে গরম উনুনের মতো আরামদায়ক তাপ পাওয়া যাচ্ছে।

ঘণ্টা বিশেক কেটে যায়। আমাদের পৃথিবীর সময়ের মাপে প্রায় এক দিন। অথচ এখানে সূর্য সবে দিগন্তরেখার ওপারে নামল। তাও আবার পুরোপুরি নয়, তার কিনারাটা এখনও পাহাড়-পর্বতের মধ্যিখানে একটা চোখ ধাঁধানো 'আলোকস্তম্ভের' মতো জ্বলজ্বল করছে।

কয়েক ঘণ্টা বাদে এই 'আলোকস্তম্ভটাও' নিভে যায়। আমাদের চারদিকের পাহাড়-পর্বতের চূড়াগুলো তখনও আলো দিচ্ছে। পরে ধীরে ধীরে সে আলোও নিভে যায়। নেমে আসে নিশ্ছিদ্র আঁধার। সেই সঙ্গে দ্রুত ঠাণ্ডা নামতে থাকে।

কিন্তু ঘাবড়িও না। বুধ ঘুরে গিয়ে যদি আমাদের ছায়ায় নিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমরাও 'উলটো দিকে ফিরে গিয়ে' ফের আলোয় চলে আসতে পারি। আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে চলে আসতে পারি আলো ও ছায়ার সীমানায়। আর আমরা যদি চলতেই থাকি তাহলে সারা সময় এই সীমানায় থেকে যাওয়া যায়।

আমরা তা-ই করব। আমাদের এমন যান আছে যা যে-কোন জায়গার ওপর দিয়ে যেতে পারে। তাতে চেপে আমরা 'সূর্যের নাগাল ধরতে' যাব।

বুধ ঘোরে আস্তে আস্তে। তাই প্রতিদিন আমাদের তেমন একটা বেশি পথ পাড়ি দিতে হবে না। ছয় মাসে আমাদের 'ভূপ্রদক্ষিণ' শেষ হবে। এই পর্যটন করার সময় আমরা গরমে বা ঠান্ডায় কোনটাতেই মরব না। সব সময় আমরা থেকে যাব 'লাগসই জায়গাটায়'। আমরা খুব চালাক, তাই না?

এই গ্রহের অদ্ভুত প্রকৃতি দেখে অবাক হয়ে যেয়ো না। এর কক্ষপথ একপাশে সামান্য হেলে গেছে। সূর্য তার ঠিক মাঝখানে নয়, একটা প্রান্তের খানিকটা কাছাকাছি। বুধ এই কক্ষপথে চলতে চলতে কখনও সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে, কখনও বা তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। বুধ থেকে সূর্যের দিকে তাকালে দেখতে পাবে সূর্য কখনও 'স্ফীত' হয়ে উঠছে, প্রচন্ড তাপ দিচ্ছে, কখনও বা 'সঙ্কুচিত' হয়ে গিয়ে তাপ কমিয়ে দিচ্ছে। এই 'ঠান্ডা ঋতুতে' বুধে শূন্যাঙ্কের ওপরে ২৫০-৩০০ ডিগ্রী ত তুচ্ছ! এই 'বিদঘুটে' কক্ষপথের জন্যেই বুধের আকাশে সূর্য সমতালে চলতে পারে না। তিন মাসে একবার তাকে গতিবেগ মন্থর করতে হয়, সে থেমে গিয়ে খানিকটা পিছনে হটে যায়। কেবল আরও একবার যেন 'শক্তি সঞ্চয়ের জন্য' স্থির হয়ে একটু দাঁড়িয়ে থেকে ফের সামনের দিকে ছুট মারে।

পরমাশ্চর্য! পৃথিবীতে এমন ঘটে না। কিন্তু এই 'পরমাশ্চর্যের' জন্যে আমাদের বেশ সুবিধাও হল। ছয় মাস ভ্রমণকালে আমরা দু'বার বিশ্রাম করতে পারলাম, একই জায়গায় দু'সপ্তাহ করে বাস করতে পারলাম। অবশ্য এটা ঠিক যে পরে সূর্য যখন ফের আকাশে নিজের পথে যাত্রা শুরু করল তখন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিনে ১৫০-২০০ কিলোমিটার আমাদের চলতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের এই যানটি সর্বত্র অবাধ গতিতে চলতে পারে বলে কোন অসুবিধাই আমাদের হয় নি।

এই ভাবে আমরা সম্পূর্ণ গ্রহটা ঘুরে এলাম। সব দেখলাম। তবে হ্যাঁ, দুঃখের কথা এই যে বুধে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। শুধুই পাথর। সর্বত্র একই রকম পাথর — মৌন, স্থির। মৃত জগৎ। চাঁদেরই মতন।

শুক্রগ্রহে আমরা কী দেখতে পাব?

এবারে এসো, শুক্রগ্রহ পরিদর্শন করা যাক। শুক্র সূর্যের দ্বিতীয় নিকটতম গ্রহ।

শুক্র বুধের মতো একেবারেই নয়। বুধ ছিল মেঘহীন, প্রায় অস্পষ্ট, হালকা বায়ুমণ্ডলে ঘেরা। নগ্ন পাথর সেখানে পালাক্রমে কখনও জ্বলন্ত সূর্যকিরণে কখনও বা ভয়ংকর হিমে পীড়িত। কিছুই নড়ে না। পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ।

এখানে সবই তার উলটো। শুক্রগ্রহের ওপরে আছে খুব ঘন, গাঢ় বায়ুমণ্ডলের 'প্রলেপ'। সেই বায়ুমণ্ডলে এত বেশি মেঘ যে গ্রহটা যেন সাদা তুলোয় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, বিন্দুমাত্র আলোর ঝলক তার ভেতর দিয়ে যায় না।

এই সাদা লেপের আড়ালে কী আছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শত শত বছর ধরে এই নিয়ে মাথা ঘামান।

সকলে একটা বিষয়ে একমত হন যে শুক্রগ্রহ নিশ্চয়ই বেশ উষ্ণ হবে, কেননা তা আমাদের তুলনায় সূর্যের কাছাকাছি।

সকলেই এটা বুঝতে পারতেন যে শুক্রে চির গোধূলির রাজত্ব। শুক্রে যদি কোন প্রাণীর অস্তিত্ব থাকেও তাহলে 'তাদের' মাথার ওপরে সব সময় ঘুরে বেড়ায় ঝড়ের মেঘ। 'তারা' ধারণাই করতে পারে না যে নীল আকাশ, সূর্য আর তারা বলে কিছু থাকতে পারে।

বাকি সব ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতে থাকেন বিজ্ঞানীরা।

একদল বেশ জোর দিয়ে বলতেন যে শুক্র হল কূলকিনারাহীন এক মহাসাগর। সেখানে আকাশ থেকে অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। এক কথায়, সর্বত্র জল আর জল।

অন্যেরা আপত্তি তুলে বলেন, ওখানকার জল অনেক আগে শুকিয়ে গেছে। শুক্র হল পুরোপুরি একটা খটখটে মরুভূমি।

কেউ কেউ আবার দুই দলের মতের মধ্যে একটা রফায় আসার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বললেন, পৃথিবীতে যা যা আছে ওখানেও সম্ভবত সে সবই আছে। সমুদ্র আছে, আবার মরুভূমিও আছে। পাহাড়-পর্বত আছে, বনজঙ্গল আছে। গরমের দরুন গাছগাছড়া সেখানে প্রচুর, ঘন। নিবিড় অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় আশ্চর্য আশ্চর্য জন্তুজানোয়ার। কালো মেঘের নীচে পাখাওয়ালা অদ্ভুত সমস্ত প্রাণী।

কার কথা যে সত্যি তা বোঝার কোন উপায় ছিল না। টেলিস্কোপে কেবল দেখা যেত সাদা তুলোর গোলা — এর বেশি আর কিছুই নয়।

তখন কাজে যোগ দিলেন বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তাঁদের টেলিস্কোপ বিশেষ ধরনের। যে চোঙ্গা দিয়ে দেখতে হয় তাঁদের ঐ টেলিস্কোপে তা নেই। তাঁরা অতি সংবেদনশীল বেতারযন্ত্র ও বিশাল থালার আকারের বিশেষ এক ধরনের এরিয়ালের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই এরিয়াল যে দিকে 'তাকায়' কেবল সেই দিক থেকে বেতার তরঙ্গ ধরে।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের এরিয়ালগুলো বিভিন্ন দিকে মুখ করে রাখলেন। দেখা গেছে সমস্ত তেতে ওঠা জিনিস থেকে বেতার তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়। অবশ্য তাই বলে কোন রকম শব্দ বা সঙ্গীত বহনের ক্ষমতা এই সমস্ত তরঙ্গের নেই। এদের যদি ধরে কোন লাউডস্পীকারে চালান করা যায় তাহলে স্রেফ খসখস আওয়াজ শোনা যাবে। কিন্তু এই খসখস নানা রকমের হয়ে থাকে। ঈষদুষ্ণ জিনিস থেকে এক রকম, উত্তপ্ত জিনিস থেকে আরেক রকম। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই আওয়াজগুলো আলাদা আলাদা করে চিনতে শিখেছেন, ফলে তাঁরা দূর থেকে কোন জিনিসের তাপমাত্রা মাপতে পারেন।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই এবারে তাঁদের যন্ত্রের এরিয়াল শুক্রগ্রহের দিকে মুখ করে রাখলেন। শুক্রগ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত বেতার-তরঙ্গ ধরার পর তাঁরা জানালেন শুক্রগ্রহের মেঘ ঠান্ডা, কিন্তু সেই মেঘের নীচেই আছে একটা প্রায় গনগনে লাল শক্ত পিঠ!

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা লোকে বিশ্বাস করল না। শুক্র একে বুধের তুলনায় সূর্য থেকে দূরে, তায় আবার মেঘে ঢাকা — সুতরাং বুধের চেয়ে গরম সে হবে কী করে?

ওখানে আসলে কী আছে পুরোপুরি জানার জন্য সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়াররা শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে শুক্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। সেগুলোর নাম 'আন্তঃগ্রহ স্বয়ংক্রিয় স্টেশন'।

এই স্টেশনগুলোর একেকটির শুক্রে পেঁছাতে তিন মাস সময় লাগে! প্রথম দুটি স্টেশন পাশ দিয়ে উড়ে চলে যায়। তৃতীয়টি শুক্রে পেঁছায় বটে, কিন্তু কোন সংবাদই পাঠাতে পারে নি। তবে এর পরেরগুলো চমৎকার ভাবে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করে। সেগুলো শুক্রগ্রহে গিয়ে সেখানকার বায়ুমণ্ডল ভেদ করে, ব্রেক কষে প্যারাসুট খুলে ধীরে ধীরে রহস্যময় মেঘের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। নামার সময় তারা তাদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে যা যা উপলব্ধি করে সে সবই অবিরাম বেতারে প্রেরণ করতে থাকে।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আনন্দ আর ধরে না! তাঁদের অনুমানই সত্য প্রমাণিত হল। স্টেশনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে ধরা পড়ল যে শুক্রের বায়ুসমুদ্রের তলদেশে গরম ৪৭০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। সত্যিকারের একটা জ্বলন্ত চুল্লি যাকে বলে।

যন্ত্রপাতি আরও বহু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাঠাল। যেমন, আমরা জানতে পারলাম যে শুক্রে দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্মে সর্বদা এই গরম থাকে; সেখানকার বায়ু আমাদের এখানকার বায়ুর চেয়ে কয়েক ডজন গুণ ঘন এবং তার উপাদানও সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের পক্ষে বিষাক্ত।

টাটানো মাটিতে নামার পর দুটো স্টেশন চারপাশের এলাকার ছবি পর্যন্ত তোলে। টেলিভিশনের সাহায্যে শুক্রগ্রহের পাথরের ক্লোজ আপও দেখায়।

এবারে তাহলে এসো, 'জীবনযাপনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী' এই গ্রহটাতে নামার চেষ্টা করে দেখা যাক।

আমাদের মহাকাশযানটি অবশ্য অগ্নিরোধক আর বেশ মজবুতও। অতএব ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে।

বিশাল তুলোর গোলাটার দিকে উড়ে আসতে আসতে গায়ে যেন কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে। নামব কোথায়? — কিছুই যে দেখা যায় না! আমাদের পায়ের নীচে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে মেঘের রাশি। আমাদের নীচে যদি সমভূমি থাকে তাহলে ভালো বলতে হবে, কিন্তু যদি থাকে পাহাড়ের ধারাল খোঁচা খোঁচা চুড়ো কিংবা অতল খাদ?

আমাদের মহাকাশযান মেঘের ভেতরে নামতে থাকে। সাদা সাদা কুণ্ডলী যেন ফুঁসতে ফুঁসতে চারধার থেকে আমাদের জড়িয়ে ধরছে, পোর্টহোলের বাইরে ছুটে চলেছে, আমাদের মাথার ঠিক ওপরে এসে মিশেছে। অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল।

দেখতে দেখতে মেঘের রাশি শেষ হয়ে গেল। এখন সেগুলো মাথার ওপর হলদেটে 'ছাদ' হয়ে আছে। আমাদের পায়ের নীচে দেখা যাচ্ছে বহু কিলোমিটারব্যাপী অতলস্পর্শ গহ্বর, তার তলায় ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট চোখে পড়ে অন্ধকার আর আলোর কিছু কিছু ছোপ। এই হল আমাদের শুক্র, তার কঠিন পিঠ!

একটা ধাক্কা! মহাকাশযানটা একদিকে কাত হয়ে পড়ে কোথায় যেন পিছলে সরে গেল, পাথরের সঙ্গে তার গায়ের
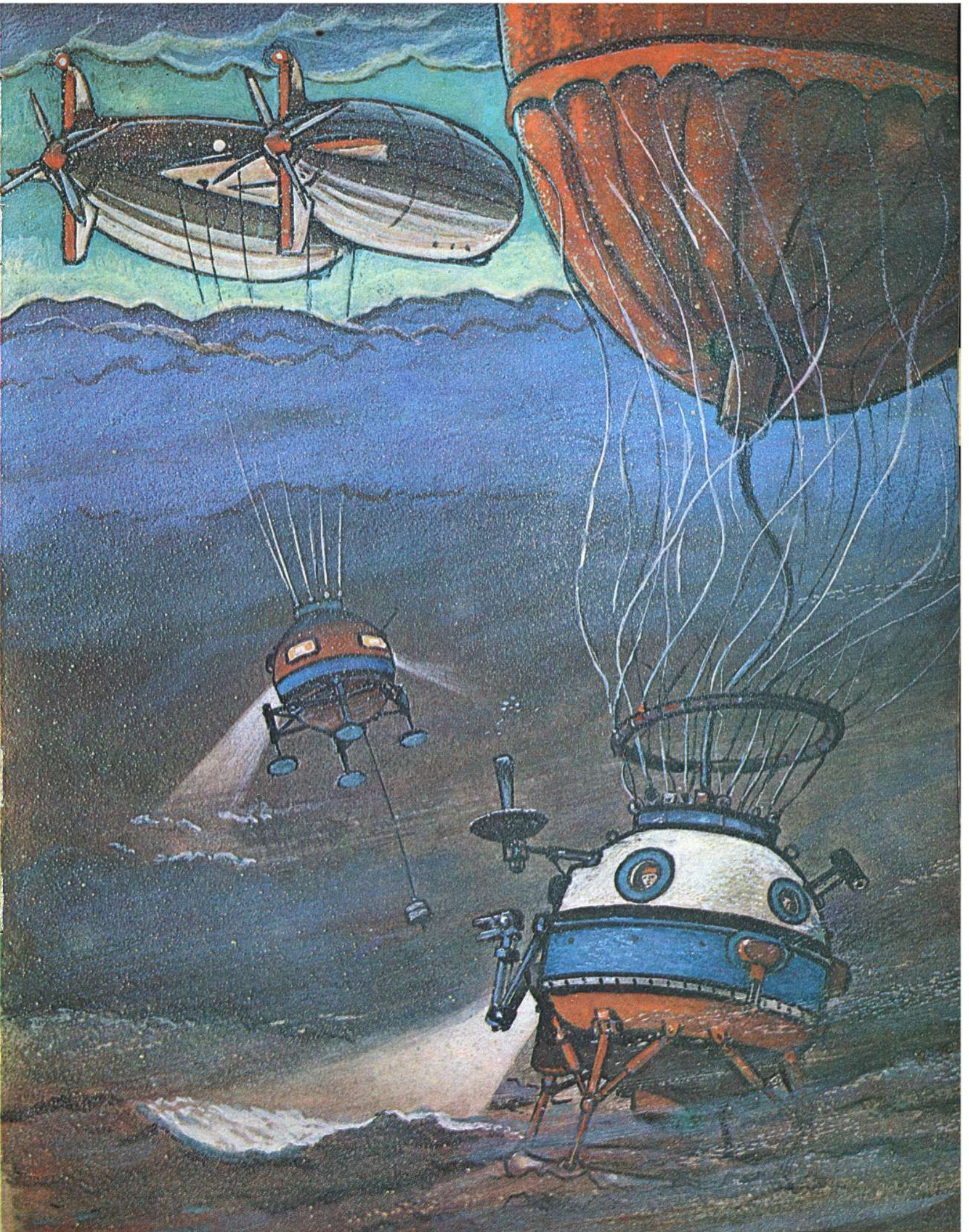
ঘষা লাগায় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে আরও একবার ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে গেল।

মনে হল সব ঠিক আছে।

অগ্নিনিরোধক স্পেসস্যুট পরে আমরা বেরিয়ে এলাম।

স্বীকার করতে বাধা নেই প্রথম প্রথম একটু ভয়-ভয়ই করতে থাকে। প্রাকৃতিক দৃশ্যটা বড়ই হতাশাব্যঞ্জক। সর্বত্র চলেছে সেই একই রকম একঘেয়ে বিবর্ণ পাথুরে মরুভূমি। কোথাও কোন ডোবা নেই, কোন ঝোপঝাড়ের চিহ্ন নেই, মোটের ওপর প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল স্থির নগ্ন পাথর আর পাথর। মাথার ওপর ধূসর-কালো রঙের মসৃণ মেঘের আচ্ছাদন। যেটুকু আলো এসে পড়েছে তা ম্যাটমেটে, ছায়াহীন। শরৎকালে মেঘলা দিনে আমাদের এখানে যেমন হয়। বাতাস ঘোলাটে, যেন সামান্য ধোঁয়া-ধোঁয়া। এই ধূসর আঁধারের মধ্যে দূরের পাথরগুলো মিলিয়ে যায়, দিগন্ত চোখে পড়ে না।

কিন্তু তা হলেও চাঁদ বা বুধের মতো শুক্র পুরোপুরি মৃত জগৎ নয়। নজর করে দেখলে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে এমন কিছু জিনিস এখানে চোখে পড়বে। বায়ু ধীরে ধীরে বইছে। এটাকে বাতাস অবশ্য ঠিক বলা যায় না। আমাদের পৃথিবীর বাতাস ক্ষিপ্র, দমকা, অস্থির প্রকৃতির। কিন্তু এখানে অনুভূতিটা এমন হয় যেন একটা বিশাল নদীর মধ্যে ডুবে আছ, আর সে নদীর জল শান্ত গম্ভীর ভাবে, ধীরেসুস্থে একই দিকে বয়ে চলেছে। এই শান্ত স্রোতের তাড়নায় ছোট ছোট নুড়ি পাথর জমির ওপর দিয়ে অলস গতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। ধোঁয়ার মধ্যে কোথাও কোথাও চোখে পড়ে মন্থরগতিতে ভাসমান ঘোলাটে ধারা — সম্ভবত ধুলো। দূরের দিকে তাকালে দেখতে পাবে পাথরগুলো সামান্য নড়াচড়া করছে, যেমন আমাদের এই পৃথিবীতে ধুনির ওপরকার গরম হাওয়ার ভেতর দিয়ে তাকালে দেখতে পাও। মোটের ওপর, বায়ুর অস্বাভাবিক ঘনত্ব পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। যখন জমির ওপর পা ফেল তখন পায়ের তলা থেকে 'কুয়াশা' ওপরে ভেসে ওঠে আর স্রোতে ধীরে ধীরে তা একপাশে সরে যেতে থাকে। আমাদের পৃথিবীতে নদীর তলার পলিমাটির মতো। দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন। স্রোত চাপ দেয়। মনে হয় যেন কেউ হাতের তালু তোমার গায়ে ঠেকিয়ে আলতো করে, অথচ জেদ ধরে তোমাকে ধাক্কা মারতে মারতে এগিয়ে যেতে বলছে। স্রোতের মুখে চলা সহজ! কিন্তু স্রোতের বিপরীতে চলা বড় কঠিন। তোমাকে নীচু হয়ে খুঁজতে হবে কোথায় পায়ের ভর দেওয়া যায়। পা তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

স্পেসস্যুটের ভেতরে গরম এখনও টের পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল পায়ের তলায়, বুটের পুরু সোল্ থাকা সত্ত্বেও ইতিমধ্যেই গরম লাগছে।

আমরা আমাদের প্রথম পরীক্ষা চালাই। সঙ্গে করে যে ফ্লাস্ক নিয়ে এসেছিলাম সেখান থেকে আধ গেলাস জল চেটাল পাথরের ওপর ঢালি। গনগনে স্টোভের ওপর পড়লে যেমন হয় — মুহূর্তের মধ্যে জল ইতস্তত বিন্দু বিন্দু হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল, পাথরের ওপর চড়বড় আওয়াজ তুলে ছটফট করতে করতে দেখতে দেখতে খানিকটা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত বাদেই পাথর খটখটে শুকনো।

আমাদের কাছে এক টুকরো সীসে আছে। সেটাকে পাথরের ওপর রাখলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছাইরঙা ধাতুর টুকরোটা গলে টলটলে রুপোলি জল হয়ে গেল।

গর্ত খোঁড়ার চেষ্টা করে দেখা যাক। শাবল দিয়ে আমরা বড় বড় পাথর উলটে ফেলি, পাথরের তলাকার মাটি ভেঙে কোদাল দিয়ে সরাই। অনেক কষ্টে পাথুরে জমির আধ মিটার খানেক গভীর পর্যন্ত খুঁড়ি। গর্তটার তলায় এক টুকরো সীসে ফেললে তা কিন্তু যেমনকার তেমন পড়ে থাকে, গলে না। তার মানে, 'অগ্নি-তপ্ত জগৎ' বলতে আমরা যাকে জানি সেটা এই গ্রহের ওপরকার একটা পাতলা স্তর মাত্র। গভীরে 'অনেকটা ঠাণ্ডা'। সেখানে তাপমাত্রা 'মোটে' শ' তিনেক ডিগ্রী।

মহাকাশযান থেকে আমরা সেই যে বেরিয়েছি তারপর কয়েক মিনিট কেটে গেছে। এখন কিন্তু আমাদের এই তাপনিরোধক স্পেসস্যুটের ভেতরেও বেশ গরম লাগতে শুরু করেছে।

আমরা আমাদের মহাকাশযানে ফিরে চলি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে হয়!

বোতাম টিপি। মহাকাশযানের মাথার ওপর বেলুন ফুলে ওঠে। আমাদের যান মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে 'ভাসতে' শুরু করে।

পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে দেখতে পাবে বাইরে ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে। তারপর হঠাৎ প্রবল ধারায় কেবিনের ভেতরে এসে ঢোকে চোখ ধাঁধানো সূর্যের আলো। আমাদের যানটা জলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ছিপির মতো মেঘের ভেতর থেকে ভুস করে ছিটকে বেরিয়ে আসে! চারধারে ফের আমাদের অভ্যস্ত, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, আলোয় প্লাবিত মহাকাশ। এখানে কী চমৎকার!

এই হল শুক্রগ্রহ। কিন্তু আমরা তাই বলে হাল ছেড়ে দিচ্ছি না।

পৃথিবীতে, জলময় মহাসাগরের তলায়ও আরামের কিছু নেই। সেখানে ঠান্ডা, চির আঁধার। কিন্তু মহাসাগরের অধিবাসীদের তাই বলে ত আর কেউ মহাসাগরের তলায় ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করছে না! সেখানে কুকুর বাস করে না, বেড়ালও বাস করে না — এমন কোন জীব বাস করে না যাদের পায়ের তলায় শক্ত মাটির দরকার। বাস করে মাছেরা। তাদের অনেকে তলা কাকে বলে জানেই না। ওখানে তারা কখনও যায় নি। সারা জীবনই তারা সাঁতার কাটে, জলের উপরিভাগের কাছাকাছি দিয়ে চলে।

শুক্রগ্রহের বায়ুসমুদ্র অনেকটা পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরেরই মতন। ঐ বায়ুসমুদ্রের উপরিভাগের কাছাকাছি সাঁতরে সাঁতরে সেখানে জীবন যাপন করা সম্ভব, এমনও ত হতে পারে?

শুক্রগ্রহের মেঘরাশির ওপরের দিকে গরম নেই। সেখানকার বায়ু প্রায় পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুর মতোই ঘন। তোমার আমার মতো মানুষ ঐরকম বায়ুসমুদ্রে সাঁতার অবশ্যই কাটতে পারবে না। আমরা পড়েই যাব। পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে নিজেকে সামলাতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে তাকেও ত বিশ্রাম নিতে হয়। কোথায় সে বসবে? ফেঁসোর মতো ছোট ছোট কীটপতঙ্গের ব্যাপার অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। এরকম বায়ুসমুদ্রে তারা ধূলিকণার মতো ভেসে থাকতে পারে, এর জন্য ডানা ঝাপটানোর পর্যন্ত দরকার হয় না।

তাই শুক্রে মেঘরাশির ওপরে ধূলিকণার মতো এই রকম খুদে খুদে জীব থাকা খুবই সম্ভব। নীচে, বায়ুর নীচের স্তরে অগ্নিকুন্ড থাকলেও তাদের কিছুই আসে যায় না। ওখানে যাবার আদৌ কোন বাসনা তাদের নেই।

মোটের ওপর শুক্র গবেষণার বিষয়। লোকে এখানে আসবে, কিন্তু বায়ুসমুদ্রের তলদেশে নামতে যাবে না। কোন্ দরকার? তারা বেলুনে বা বায়ুযানে চেপে মেঘের ওপরে ভেসে ভেসে যাবে। নানা রকম অগ্নিরোধক যন্ত্রপাতি নীচে নামিয়ে দিয়ে, র‍্যাডারের সাহায্যে গ্রহের উপরিভাগ হাতড়ে হাতড়ে তারা শুক্রের মানচিত্র তৈরি করে ফেলবে। হয়ত সেখানে পাওয়া যাবে উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বত, যার চূড়ায় গরম তেমন বেশি নেই। আবার সেখানকার মেরুপ্রদেশ স্নিগ্ধও হতে পারে।

কোন কোন বিজ্ঞানী এমন অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে শুক্রকে 'গোছগাছ করে' বসবাসের উপযোগী করে তোলা যায়। তারা বলেন এর জন্য দরকার শুক্রের আবহমন্ডলে এক বিশেষ ধরনের কীটাণু ছেড়ে দেওয়া। বায়ুমন্ডলে ভাসতে ভাসতে তারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করবে, সমস্ত গ্রহে ছড়িয়ে পড়বে এবং কয়েক বছরের মধ্যে শুক্রের বায়ুর উপাদান পালটে ফেলবে। বায়ুমন্ডলে স্বচ্ছতা আনবে।

তখন গ্রহের পিঠ ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসবে। মেঘ থেকে তার ওপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরবে। তার বুকে দেখা দেবে নদী, সরোবর, সমুদ্র। আর্দ্র জমিতে লোকে বীজ বুনবে। বনজঙ্গল গজাবে। বনজঙ্গল বায়ুকে অক্সিজেন যোগাবে, ফলে বায়ু জীবজন্তু ও মানুষের নিশ্বাস গ্রহণের উপযোগী হয়ে উঠবে।

প্রলোভন জাগায়, তাই না? 'দ্বিতীয় পৃথিবী' গড়ে তোলা — একবার ভেবে দেখ দেখি!

আপাতত এটাকে আমরা কল্পনাবিলাসই বলব। আপাতত, বলছি। পরে কী হবে সে দেখা যাবে। শুক্রকে ঢেলে সাজানোর আগে তাকে নিয়ে ভালোমতো গবেষণা করতে হবে।

মার্কিন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র শুক্রের চারদিকে ঘুরে র‍্যাডারের সাহায্যে মেঘের ভেতর দিয়ে তার পিঠ হাতড়ে দেখেছে। তা থেকে ওখানে কোথায় পাহাড়-পর্বত আছে, কোথায় সমভূমি আছে জানা সম্ভব হয়েছে, গ্রহটির মানচিত্রও তৈরি করা গেছে। শুক্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্টেশনগুলোও অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। এরকম প্রতিটি স্টেশন এই আশ্চর্য গ্রহটির প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন নতুন নানা তথ্য পাঠায়।

আচ্ছা, আপাতত আরও দূরে যাত্রা করা যাক। আমরা তৃতীয় গ্রহটিতে না থেমে তার পাশ কাটিয়ে চলে যাব এবারে। ওটা ত আমাদেরই গ্রহ — পৃথিবী। আমাদের বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে হাত নেড়ে যাত্রা করি সোজা চতুর্থ গ্রহে — মঙ্গলে!

মঙ্গলগ্রহে মঙ্গলবাসী আছে কি?

মঙ্গলের দিকে উড়ে চলেছি। পেঁছুতে এখনও ঢের দেরি আছে, কিন্তু গ্রহটিকে দেখা যাচ্ছে লালচে বালি রঙের গোলার মতন।

শুক্রের সঙ্গে মঙ্গলের অমিল বড়ই বেশি। মঙ্গল হালকা স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলে জড়ানো। বায়ুমণ্ডল নির্মেঘ। মঙ্গলে কোন কিছুর আবরণ নেই, তাই তার সমস্ত খুঁটিনাটি ভালো করে দেখা যায়।

তার ওপরে একটা দিকে জেগে আছে একটা উজ্জ্বল সাদা ছোপ। অনেকটা টোপরের মতো। এটা মঙ্গলের দুটি মেরুর একটি। মঙ্গলে যখন শীতকাল কেবল তখনই এই টোপরটা দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে থাকে না। তাহলে কি এটা তুষার?

মঙ্গলের অধিকাংশ জায়গা আলোকিত, লালচে রঙের। এই পটভূমিকার ওপর চোখে পড়ে গাঢ় ধূসর বর্ণের কিছু ছোপ। লোকে যখন প্রথম টেলিস্কোপ দিয়ে মঙ্গলকে দেখতে পায় তখন তারা ঐ ছোপগুলোকে 'সমুদ্র' বলত। তারা ভেবেছিল ওগুলো বুঝি আমাদের পৃথিবীর সমুদ্রের মতোই জলপূর্ণ। কিন্তু তা যদি হত তাহলে ত সূর্যের কিরণে জল চকচক করত। অথচ মঙ্গলে কস্মিনকালে কোন জিনিস চকচক করতে দেখা যায় না। লোকে শিগগিরই বুঝতে পারল গ্রহটির অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশগুলো একেবারে শুকনো।

কিন্তু 'সমুদ্র' নামটা রয়েই গেল।

নিরীক্ষণ করে দেখতে গেলে কখন কখন মনে হতে পারে যে বড় বড় কালো ছোপ ছাড়াও মঙ্গলে যেন অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছে অদ্ভুত কালো কালো কিছু রেখা। রেখাগুলো সূক্ষ্ম, টানা সুতোর মতো সোজা চলে গেছে। চলে গেছে নানা দিকে। ভাঙা হাঁড়ির ওপরকার ফাটলের মতো, দেখে মনে হয় এই বুঝি ভেঙে পড়ে যাবে।

এই রহস্যময় রেখাগুলোকে বলা হত 'খাল'। যদিও লোকের বুঝতে বাকি ছিল না যে 'সমুদ্র' যদি শুকনো হয় তাহলে 'খালও' জলপূর্ণ হতে পারে না; বিশেষত প্রস্থে যখন সেগুলো কয়েক ডজন কিলোমিটার!

লক্ষ করা গেছে যে মঙ্গলের 'সমুদ্র' ও 'খালগুলো' শীতকালে ফিকে। বসন্তকালে সেগুলোতে গাঢ় রঙ ধরতে থাকে — যেন তারা 'রসে টৈটম্বুর' হয়ে উঠছে। কখন-কখন মনে হয় যেন সবজেটে। শরৎকালে আবার ফিকে হতে থাকে।

কিন্তু এই একই ব্যাপার ত ঘটে আমাদের পৃথিবীর বনে-জঙ্গলে। শীতকালে গাছপালা নগ্ন। এই সময় যদি ওপর থেকে, এই ধরো, এরোপ্লেন থেকে বনের দিকে তাকানো যায় তাহলে তাকে দেখাবে ধূসর, ম্লান স্বচ্ছ। আর গ্রীষ্মকালে গাছপালা ঢেকে যায় সবুজ পাতায়। বন ক্রমশ গাঢ় রঙ ধারণ করে।

এই কারণে অনেকের ধারণা হল যে মঙ্গলের ঐ গাঢ় রঙের ছোপগ‌ুলো তার বন। আর যেখানে গাছপালা জন্মায় সেখানকার জমি ভিজে ও নাবাল না হয়ে যায় না।

একথা বিশ্বাস না করা কঠিন ছিল, কেননা মঙ্গলের 'বনভূমি' ঠিক তখনই গাঢ় হতে শ‌ুর‌ু করে যখন তার মের‌ুর তুষার-টোপরটা গলতে থাকে। গাঢ় রঙ ধরে প্রথমে টোপরটার ঠিক কাছে, তারপর ধীরে ধীরে দ‌ূরে আরও দ‌ূরে ছড়িয়ে পড়ে। দেখে মনে হয় যেন বরফগলা জল গ্রহের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে আর তার ছোঁয়া পেয়ে উদ্ভিদকুলে প্রাণের সাড়া পড়ে গেছে।

কিন্তু কী ভাবে সেই জল বয়ে চলে? ঐ 'খালগ‌ুলো' দিয়ে নয় কি? তাহলে 'খালগ‌ুলো' এমন সোজা চলে গেছে কেন?

প্রকৃতিতে সরল রেখা প্রায় হয় না বললেই চলে। নদী এঁকেবেঁকে চলে। সম‌ুদ্রের উপকূল ক্ষতবিক্ষত — সেখানে আছে খাড়ির পর খাড়ি। পাহাড়-পর্বত ত যেমন তেমন খ‌ুশি ডাঁই করা।

তবে মান‌ুষ সরল রেখা টানতে ভালোবাসে। সে সরল রেখায় বাঁধ বাঁধে, তাতে বেশ শস্তা হয়। বনের ভেতর দিয়ে পথ কাটে সরল রেখায়, তাতে বিস্তর স‌ুবিধা। মান‌ুষ ব‌ুদ্ধিমান প্রাণী, তাই যে কোন জিনিস যতটা সম্ভব ভালো সে তৈরি করে।

তাই কোন কোন বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে এলেন যে মঙ্গলের টানা 'খালগ‌ুলো' ব‌ুদ্ধিমান মঙ্গলবাসীদের তৈরি। তাঁদের মতে, মঙ্গলে জল কম। মঙ্গলের বহ‌ুদ‌ূর বিস্তৃত আলোকিত ছোপগ‌ুলো সবই শ‌ুকনো বাল‌ু। সেখানে না আছে কোন সম‌ুদ্র, না সরোবর, না নদী। এমনকি সেখানে বৃষ্টিও হয় না। কিন্তু জল ছাড়া কী ভাবে জীবন ধারণ করা সম্ভব? তাই বসন্তকালে মের‌ুতে যখন তুষারটোপর গলতে থাকে তখন মঙ্গলবাসীরা সযত্নে মহাম‌ূল্যবান বারিকণা সংগ্রহ করে, এক ধরনের পাইপ দিয়ে জল পাঠিয়ে দেয় গরম দেশে, তাদের চাষবাসের জায়গায়, নিজেদের শহরগ‌ুলোতে।

জল যাতে বেশ তাড়াতাড়ি পেঁছ‌ুতে পারে তার জন্য পাইপগ‌ুলো সোজা টানা হয়। এই পাইপলাইনগ‌ুলো বরাবর মঙ্গলগ্রহে গ্রহবাসীদের সবুজ খেত, মাঠ ও বাগান আছে — সেখানে জল সেচন করা হয়। এর পরে সর্বত্র ঊষর মর‌ু। সমস্ত গ্রহে সরবরাহ করার মতো যথেষ্ট জল নেই।

স‌ুতোয় গাঁথা প‌ুঁতির মতো জলের পাইপলাইনে গাঁথা এই সব‌ুজ জমিগ‌ুলোকেই নাকি আমরা গাঢ়রঙের রহস্যময় ফালির আকারে দ‌ূর থেকে দেখতে পাই।

মান‌ুষের কল্পনায় কী স‌ুন্দরই না মনে হয় এই সব! মঙ্গলের শহর! মঙ্গলবাসীদের প্রাসাদ! তাদের কুস‌ুমিত বাগান!..

কিন্তু মঙ্গলের যত কাছে আমরা আসতে থাকি, একের পর এক আমাদের মোহভঙ্গ হতে থাকে।

প্রায় সমস্ত আলোকিত জায়গাই, আমরা যেমন ভেবেছিলাম, মর‌ুপ্রান্তর। অবশ্য এটাও ঠিক যে কোথাও কোথাও চাঁদের গহ‌্বরের মতো গোল গোল নীচু গর্ত আছে। কিন্তু 'সম‌ুদ্র' বলতে আমরা যা মনে করতাম দেখা যাচ্ছে তা সম্প‌ূর্ণ উলটো। 'বনজঙ্গলে ভর্তি' কোন 'ভিজে নাবাল জমি' আদৌ নয়। প্রায় সমস্তটাই স্রেফ অন‌ুর্বর পাহাড়ী এলাকা।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে কাছ থেকে কিন্তু 'খালগ‌ুলোকেও' আর দেখা যাচ্ছে না। সে জায়গায় চোখে পড়ছে একই রকম পাহাড়-পর্বত, গহ‌্বর, খাত — যেমন আশেপাশের সর্বত্র আছে।

এরকম কেন হল? সমভূমির চেয়ে পাহাড়-পর্বত বেশি কালো কেন? বসন্তকালে সেগ‌ুলো আরও কালো হয়ে যায় কেন? কোথায় গেল সেই 'খালগ‌ুলো'? সেখান থেকে যে চাঞ্চল্যকর অনেক কিছ‌ু আমরা আশা করেছিলাম!

যত কাছে আসতে থাকি মঙ্গলের 'ম‌ূল রহস্যগ‌ুলো' ততই অল্প অল্প করে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসতে থাকে।

মঙ্গলে বিস্তর ধ‌ুলোবালি। আমাদের পৃথিবীতে যেমন, তেমনি ওখানেও ধ‌ুলোবালি খালি পাথরের চাঁইয়ের তুলনায় উজ্জ‌্বল।
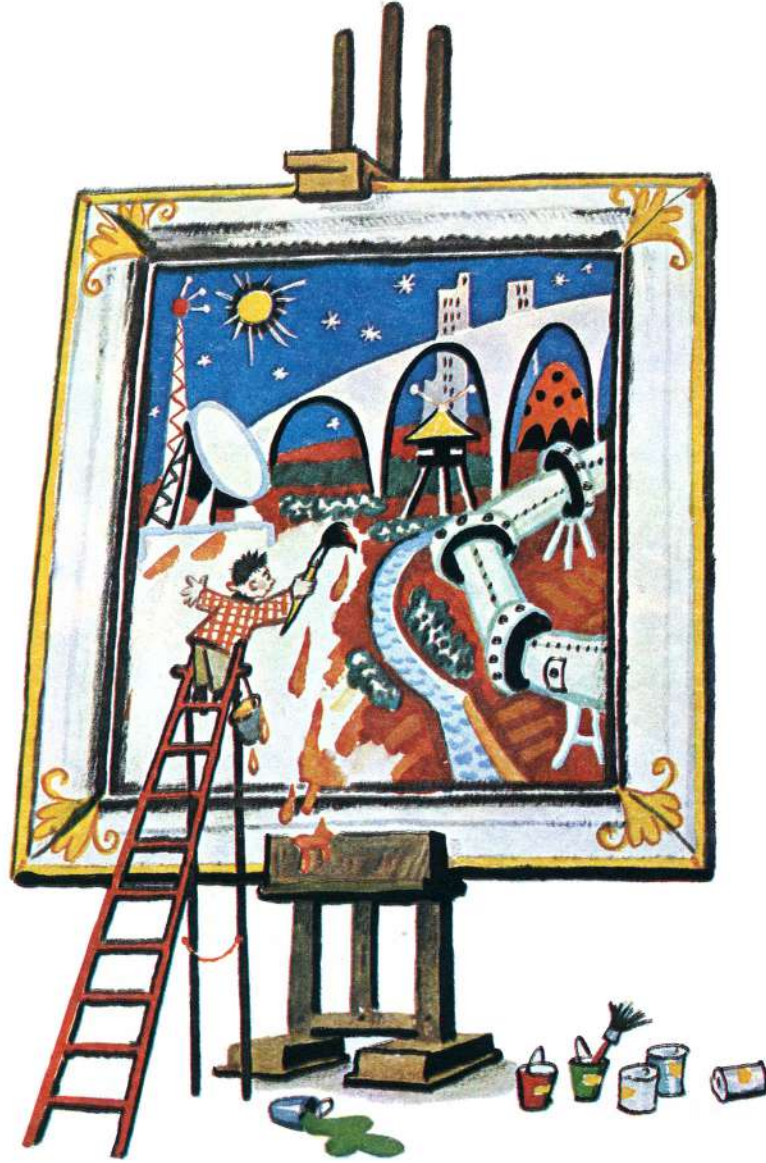
মঙ্গলে বাতাসের খুব জোর। গ্রহের যে সমস্ত জায়গা উঠে আছে প্রবল বাতাস সেখান থেকে ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। অর্থাৎ পাহাড় থেকে ধুলো যায় নাবাল জমিতে। পাহাড় সব সময় বাতাসের ফুঁয়ে পরিষ্কার। এই জন্য কালো দেখায়। কিন্তু তার পাদদেশে যে সমভূমি সেখানে সব সময় ঝেঁটিয়ে রাজ্যের ধুলোবালি এসে জমছে। তাই সেইখানটা উজ্জ্বল।

বসন্তকালে মেরুতে বরফ গলে। সেখান থেকে ভিজে বাতাস বইতে থাকে। সেই বাতাসে গ্রহ 'ধোয়ামোছা' হয়ে যায়। এর পর পাহাড়-পর্বত খানিকটা 'সতেজ হওয়ার' ফলে আরও কালো দেখায়। গোটা ব্যাপারটা খুবই সহজ। বনের সঙ্গে এর কোন রকম সম্পর্ক নেই।

তা না হয় হল, কিন্তু 'খাল'? এটা সম্ভবত দৃষ্টিবিভ্রম। খাত, গহ্বর ইত্যাদি 'এবড়োখেবড়ো জায়গাগুলো' মঙ্গলে পুরোপুরি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোথাও ঘন, কোথাও বিরল। তবে কোথাও হয়ত দৈবাৎ তিনটে কি চারটে গহ্বর সার বেঁধে আছে। কোথাও হয়ত দৈবাৎ প্রায় সরল রেখায় চলে গেছে পর্বতশ্রেণী। কোথাও বা দৈবাৎ মরুভূমির বুক চিরে তীরের মতো সোজা চলে গেছে বিশাল
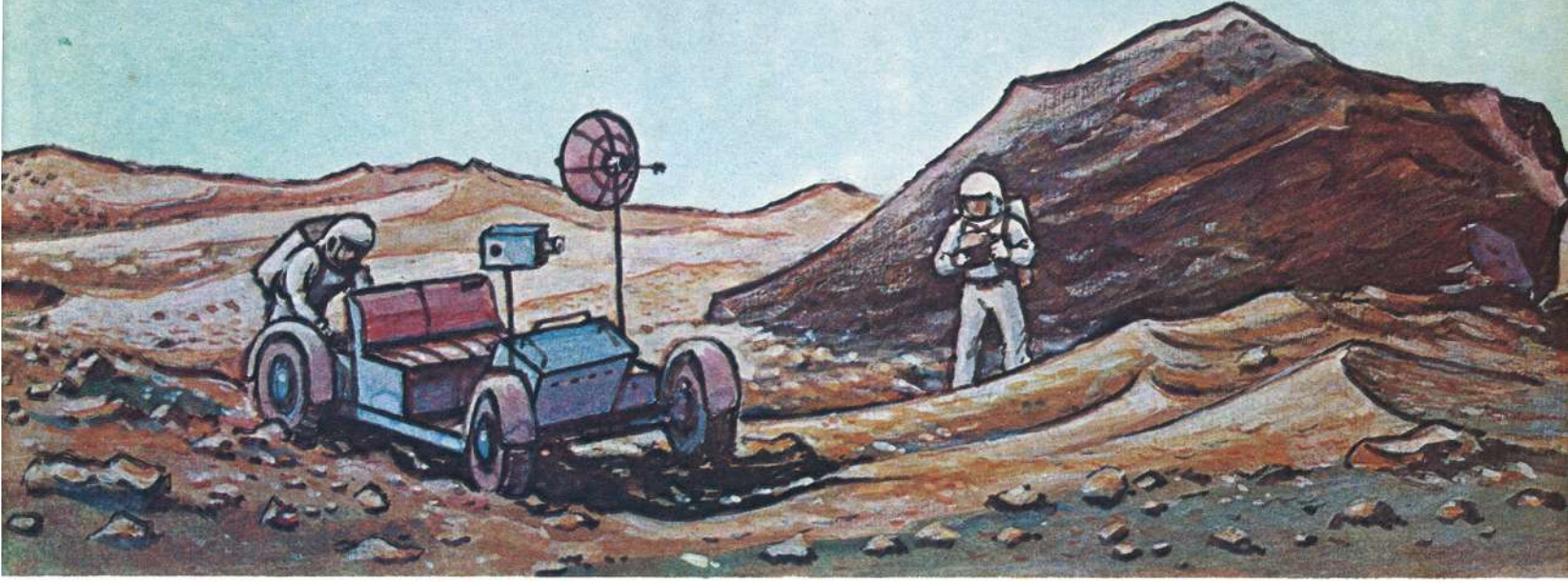
বিশাল খাত। সবগুলো জায়গা দূরে কালো কালো টানা ফালি বলে আমাদের মনে হয়।

কিন্তু এখন পর্যন্ত বুদ্ধিমান মঙ্গলবাসীদের নির্মাণকলার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। বরং দেখেশুনে মনে হয় সে রকম কোন প্রাণী ওখানে নেই।

তবু মঙ্গলকে চাঁদ, বুধ বা শুক্রের মতো প্রাণহীন গ্রহ বলে আমাদের মনে হয় না। ঐ গ্রহগুলো চুল্লীতে ঝাঁই পোড়া পাথরের মতো যা তা রকমের শুকনো। জল ছাড়া ত আর কোন রকমের জীবন সম্ভব নয়! কিন্তু মঙ্গল আর যাই হোক, একটু 'ভিজ-ভিজে'।

গোটা কয়েক সোভিয়েত ও মার্কিন স্বয়ংক্রিয় স্টেশন মঙ্গলের দিকে যায়। সেগুলো গ্রহের চারধারে ঘুরে ঘুরে যন্ত্রপাতির সাহায্যে তার ওপর অনুসন্ধান চালায়, চতুর্দিক থেকে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করে। এ থেকে কৌতূহলজনক অনেক কিছু জানা গেছে।

জানা গেছে মঙ্গলের দুই মেরুর ঐ যে সাদা টোপর ওগুলো প্রধানত গড়ে উঠেছে 'শুকনো বরফে', যে শুকনো বরফ পৃথিবীতে আমরা আইসক্রীমের বাক্সে রাখি। এছাড়াও অবশ্য আছে আমাদের সাধারণ তুষার — ঠাণ্ডায় জমা জল। বসন্তে সেই তুষার গলে বাষ্প হয়ে যায়। আর্দ্রতা বায়ুতে সঞ্চারিত হয়, বায়ুপ্রবাহে তাড়িত হয়ে চলে যায় গ্রহের উষ্ণ অংশগুলোতে; সেখানে রাতের পর রাত সাদা হিমকণা হয়ে ঝরে পড়তে থাকে ঠাণ্ডায় জমাট জমির ওপর। প্রভাতী সূর্যের কিরণে হিমকণা গলে যায়, ফলে কয়েক মিনিটের জন্য মাটি ভিজে যায়। উদ্ভিদ অথবা কীটপতঙ্গের মতো চেতন পদার্থ এই সময়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জল পেতে পারে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে মঙ্গলকে কাছ থেকে নিরীক্ষণ করার পর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো সেখানে মজা নদীর খাত দেখতে পায় এবং তার আলোকচিত্রও গ্রহণ করে। তার মানে, এই কিছুকাল আগেও মঙ্গলে প্রবল জলধারা ছুটে চলত? পরে তাহলে সমস্ত জলপ্রবাহ গেল কোথায়? তাহলে কি মাটি সেগুলো শুষে নিয়েছে আর সেখানেই জমাট হয়ে গেছে? মঙ্গলে ত আবার ঠাণ্ডাও বটে।

কিন্তু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে আবার 'চুল্লিও' দেখতে পাওয়া গেছে — সেগুলো মাটির তলায় জমাট জল গলানোর ক্ষমতা রাখে। মঙ্গলে আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গেছে। ঐ সমস্ত আগ্নেয়গিরি এখন অবশ্য আর অগ্ন্যুদ্‌গীরণ করে না, নিভে গেছে। কিন্তু তা হলেও তাদের চারপাশে, নীচ থেকে, গ্রহের গভীর তলদেশ থেকে উত্তাপ যায়। এর ফলে জমাট মাটি গলতে পারে। আর কোন আগ্নেয়গিরি থেকে যদি অগ্ন্যুদ্‌গীরণ শুরু হয়, সেখান থেকে গনগনে লাভাস্রোত বেরিয়ে আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের সব কিছু গরম হয়ে উঠবে, তখন শতধারে উপছে পড়বে।

এ সমস্তর অর্থ হল এই যে মঙ্গলে জীবিত প্রাণীর পক্ষে ওপরের বায়ু থেকে এবং নীচের মাটি থেকে জল সংগ্রহ করার পথে কোন বাধা নেই।

এই কারণেই আমাদের মনে হয় মঙ্গলে 'কেউ না কেউ' অন্তত বাস করে। কিন্তু কে?

অবশ্য সেখানে যে 'মানুষ' আছে এমন মনে করার খুব একটা কারণ আমরা দেখি না। কিন্তু এই ধর, গাছগাছড়া, ছোটখাটো প্রাণী — এরা ত থাকতেই পারে।

ওখানে কোথায় তারা বাস করতে পারে? কোথায় তাদের খোঁজ করা যায়?

আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণীরা বাস করে গ্রহের পিঠে। সেটাই তাদের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক। উষ্ণতা আর জল দুইই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু মঙ্গলে সম্ভবত মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে বাস করা বেশি সুবিধার। যদি মাটির ওপরে উঠতেই হয় ত কেবল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে, যেখানে বেশ উষ্ণতা আছে, আর আর্দ্রতাও বেশি আছে।

এবারে সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা বলি। মঙ্গলের পাহাড়-পর্বত ও প্রান্তরের ওপর দিয়ে ওড়ার সময় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অনেকগুলো রঙিন ছবি তোলে। সেই সব ছবিতে দেখা গেছে কিছু কিছু গহ্বরের তলদেশে সবুজ-সবুজ! বলা যায় না, এটাই হয়ত মঙ্গলগ্রহে 'প্রাণের চিহ্ন'? হয়ত বা আমরা এখনই দেখতে পাব মঙ্গলের 'কল্পনাতীত', আশ্চর্য কোন গাছগাছড়ার সবুজ পাতার গালিচা, যার মধ্যে গিজগিজ করছে আমাদের অজানা, অলৌকিক সমস্ত খুদে খুদে জন্তুজানোয়ার?

১৯৭৬ সালে 'ভাইকিং-১' ও 'ভাইকিং-২' নামে দুটি মার্কিন স্বয়ংক্রিয় স্টেশন মঙ্গলে নামে। মঙ্গলে সত্যি সত্যিই প্রাণ আছে না নেই, পুরোপুরি জানার ভার তাদের ওপর দেওয়া হয়েছিল।

'ভাইকিং' স্টেশনদুটো তাদের ধাতব মাথা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে রেডিওর সাহায্যে মঙ্গলের চারপাশের এলাকার সুন্দর সুন্দর আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠায়। আলোকচিত্রে দেখা গেল সীমাহীন বালির মরুভূমি, তার ওপর পড়ে আছে অর্ধেক বালিতে ঢাকা সব পাথর।

আলোকচিত্রে জীবনের সামান্যতম লক্ষণও দেখা গেল না।

এরপর 'ভাইকিং' স্টেশনদুটো তাদের কাছাকাছি জায়গায় মাটি খুঁড়ে সেই মাটি 'গিলে' ভেতরে নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে লাগল তার মধ্যে অন্তত অতি ক্ষুদ্র আকারের এমন কোন জীবন্ত ব্যাক্টেরিয়া আছে কিনা যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। পৃথিবীতে কিন্তু তারা সর্বত্র আছে — এমনকি মরুভূমির বালুতেও।

স্টেশনদুটোর কাজের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। তারা শেষ পর্যন্ত জানাল: 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে মঙ্গলে জীবন্ত কিছুই নেই। আবার একেবারেই যে কিছু নেই এমন কথাও হলফ করে বলা যায় না।'

বোঝ কাণ্ড! এর অর্থ কী? মানুষ তাই আজ পর্যন্ত জানতে পারে নি মঙ্গলে প্রাণ আছে কি নেই।

কিন্তু প্রাণ নিঃসন্দেহে সেখানে থাকা সম্ভব। তাই আগের মতোই আমরা আশা করতে পারি যে আজ হোক কাল হোক একদিন আমরা ওখানে প্রাণের খোঁজ পাব।

যাই হোক, আমরা মঙ্গলের কাছাকাছি এসে পেঁছুলাম। একটা সমতলমতো জায়গা বেছে নিয়ে মহাকাশযান নামালাম।

আকাশ নির্মেঘ, গাঢ় বেগনী রঙের — যেমন আমরা দেখেছি বুধে। বুধের আকাশের মতো এখানেও উজ্জ্বল আলো থেকে নিজেকে আড়াল করলে দিনের বেলায় তারা দেখা যায়।

চারদিকে তাকিয়ে দেখি। একদিকে আদিগন্ত বিস্তৃত নয়নাভিরাম বালির ঢিবি। অন্য দিকে, সামান্য দূরে দেখা যাচ্ছে মনোরম শিলাময় পাহাড়ের শ্রেণী।

পায়ে হেঁটে রওনা দিই এই পাহাড়ের দিকে।

আমাদের পরনে অবশ্য স্পেস্‌স্যুট আছে। নিশ্বাস নিতে হচ্ছে সিলিন্ডার থেকে, আমাদের পৃথিবীর বাতাসের সাহায্যে। এখানকার বাতাসের যা গঠন তাতে আমাদের পোষাবে না। তাছাড়া এ বাতাস আমাদের বাতাসের চেয়ে একশ' গুণ বেশি হালকা।

এই রকম পাতলা হাওয়ায় কোন পাখি বা কীটপতঙ্গ ভেসে থাকতে পারে না। মঙ্গলে কেবল বুকে হাঁটা যায়, দৌড়ানো ও লাফানো যায়।

মঙ্গলবাসী বলে যদি কোন প্রাণী থাকে ত পাখাওয়ালা তারা কোন রকমেই হতে পারে না।

মঙ্গলবাসী! তাদের সম্পর্কে মানুষের কতই না জল্পনা-কল্পনা!

কেউ কেউ মনে করে তারা সম্ভবত খুবই ছোট — পিপড়ের সমান।

কেউ কেউ তাদের শুঁড়ওয়ালা আটপেয়ে জীব বলে কল্পনা করে।

কারও কারও ধারণায় তারা সম্ভবত মানুষেরই মতন।

আচ্ছা সত্যিই যদি তাই হয়?

যে রকমই তারা হোক না কেন, পৃথিবী সম্পর্কে সম্ভবত তাদের খুব কৌতূহল। তাদের যদি আমরা দেখা পাই তাহলে একজন মঙ্গলবাসীকে অন্তত আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব। তাকে দেখাব আমাদের গ্রহ।

অবশ্য এটা ঠিক যে আমাদের এই পৃথিবীর আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দফা-রফা হয়ে যাবে। তাকে একটা জানলাসমেত ছোটখাটো ফ্রিজের ভেতরে বসিয়ে পৃথিবী ঘোরাতে হবে।

এই ছোট্ট জানলার ভেতর দিয়ে যখন সে পৃথিবীর সমুদ্র দেখতে পাবে তখন হয়ত ঈর্ষায় তার চোখ ফেটে জল আসবে। মিঠাইয়ের পাহাড় আর ক্ষীরের নদী দেখলে আমাদের যে অবস্থা হবে তারও অবস্থা হবে সেই রকম। মঙ্গলে জল সম্ভবত মহামূল্যবান বস্তুর মতো বোতলে করে বিক্রি হয়। কিন্তু পৃথিবীতে মহাসাগর ভরতি জল আর জল — সে জলের কানাকড়ি দাম নেই।

আমাদের এই খুদে মঙ্গলবাসীটি সম্ভবত সারা দিন মুগ্ধ হয়ে দেখত পৃথিবীর মেঘ। তাদের ওখানে এরকম যে কিছুই নেই! আমাদের মেঘ কতই না সুন্দর হয়ে থাকে — বিশেষত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়!

পাহাড়ের দিকে যেমন চলছিলাম সেই রকম চলা যাক। বেশ দূরের পথ। ঝুরঝুরে বালিতে পা ডুবে যায়।

পাহাড়ের ঢালে ইতিমধ্যে সবুজ আভা দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন শিলাখণ্ডের ওপর জায়গায় জায়গায় শেওলার পোঁচ পড়েছে।

শৈলমালা এবারে একেবারে কাছে। দূর থেকে আমরা যাকে শেওলা বলে ভেবেছিলাম এখন তাকে নীচু নীচু ঝোপঝাড়ের মতো দেখাচ্ছে।

এমন সময়!.. এই ঝোপঝাড়ের নীচেই কী যেন নড়েচড়ে উঠল! জীবন্ত কেউ একটা লাফিয়ে আমাদের দিকে এলো, ফের মিলিয়ে গেল ঝোপঝাড়ের নীচে!.. আরে, 'ওরা' যে দেখছি সংখ্যায় অনেক!.. ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে!.. আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।...

ওরা কারা?

. . . .

না, আমাদের এই গল্পকথা আর বাড়াব না। তোমরা বুঝতে পারছ, মঙ্গলে আসলে এখনও কেউ যেতে পারে নি। তাই এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে তোমরা নিজেরাই আরও ভালো করে কল্পনাবিলাস করতে পার। যার যেমন খুশি। এতে আরও মজা পাবে। বড় হয়ে তোমরা নিজেরাই মঙ্গলে গিয়ে দেখে এসো কার কথা সত্যি।

বৃহস্পতি আর শনি কেমন?

বুধ, শুক্র ও মঙ্গলে আমরা নামতে পেরেছিলাম। তেমন একটা স্বাচ্ছন্দ্যকর না হলেও অন্ততপক্ষে কোন কিছুর ওপর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশটা নিরীক্ষণ করা যায়।

কিন্তু বৃহস্পতি ও শনির কথা যদি বল, সেখানে নামা একেবারে অসম্ভব। এই দুই গ্রহ বস্তুতপক্ষে স্রেফ মেঘ দিয়ে তৈরি বললেও আপত্তি করার কিছু নেই।

যেমন ধর বৃহস্পতিগ্রহটি — যত বড় দেখায় আসলে কিন্তু তত বড় নয়। কিন্তু এটা আছে কুলের ভেতরকার বীচির মতো — বিশাল মেঘের গোলার ভেতরে। আমরা বলি 'বৃহস্পতি কী বিরাট!' কিন্তু বিরাট বলতে ত কেবল তার পোশাকটা।

কিন্তু বৃহস্পতির আছে দস্তুরমতো চৌদ্দটি উপগ্রহ — চৌদ্দটি চাঁদ। তাদের মধ্যে কতকগুলো খুবই বড়। দুটো আমাদের চাঁদের সমান, দুটো ত আবার আয়তনে বুধের চেয়ে কম যায় না।

পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোর কোন রকম খুঁটিনাটি আলাদা করে বোঝার উপায় নেই। বড় বেশি দূরে। কিন্তু হালে মার্কিন স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'পাইওনীয়র' ও 'ভয়েজার' বৃহস্পতি ও শনির পাশ দিয়ে উড়ে গেছে। তারা খুব কাছ থেকে ঐ দুই গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহদের আলোকচিত্র গ্রহণ করেছে। দেখা গেছে বৃহস্পতির সবচেয়ে বড় বড় উপগ্রহগুলো খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

'ইও' হল একটা 'মরচে' রঙের গোলা। ভেতরটা সম্ভবত বেজায় গরম। সেখানে সব সময় আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্‌গীরণ চলছে।

'ইউরোপা' — উজ্জ্বল, সাদা-সোনালি রঙের, সমান, যেন পালিশ করা। কিন্তু আগাগোড়া চিড়-খাওয়া।

'গানিমিড' — সবচেয়ে বড়, কালো, তার গায়ে আগাগোড়া সাদা সাদা আঁচড়। দেখে মনে হয় যেন কঠিন বরফে তৈরি, কালো খোসায় ঢাকা, তার ওপরে যেন ধারালো কোন কিছু দিয়ে সপাং সপাং করে মারা হয়েছে।

'কাল্‌লিস্টো' — বিশাল, খয়েরিরঙের, একেবারে ভাঙাচোরা। আগাগোড়া গর্তে আর গর্তে ক্ষতবিক্ষত।

বৃহস্পতিকে রসিয়ে রসিয়ে দেখতে গেলে নামতে হয় 'ইওতে'। আর সব উপগ্রহের চেয়ে এটাই বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছে।

বৃহস্পতি খুব দ্রুত ঘুরছে বলে তার বিষুবরেখা বরাবর এলাকায় মেঘের প্রলেপ পড়েছে — খরস্রোতা নদীর বুকে জলের ধারার মতো।

মেঘের এই ধারাগুলো অনবরত একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, আকার বদল করছে।

এক জায়গায়, বৃহস্পতির সাদা সাদা ফালির মধ্যে কোন কোন সময় চোখে পড়ে একটা অদ্ভুত লাল দাগ। নদীর তলা থেকে জল ঘুলিয়ে উঠলে যেমন হয় এই জায়গাটায়ও যেন ঠিক তেমনি কোন গভীর তলদেশ থেকে উঠছে লাল ধোঁয়া। রক্তিম মেঘ সাদা মেঘের ধারা কেটে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, কখনও উজ্জ্বল হয়ে আসছে, কখনও বা ফেকাসে।

বলা যায় না, হয়ত এই মেঘের সমুদ্রের তলায় কোন এক আগ্নেয়গিরি ফুঁসে উঠে অগ্ন্যুদ্‌গীরণ করছে, কখনও নিভে যাচ্ছে, কখনও বা নবোদ্যমে জ্বলে উঠছে? কোন একদিন বৃহস্পতির এই রহস্যের সমাধান তোমরা করবে।

আপাতত আরও দূরে যাওয়া যাক।

এর পরের গ্রহ — শনি। বৃহস্পতির সঙ্গে তার খুব মিল। বৃহস্পতির মতো এটাও এক বিরাট মেঘের গোলা — এই মেঘের গোলার গভীরে আছে শক্ত শাঁস। শনিকে ঘিরে আছে একটা বেড়। এই জন্যে তাকে দেখতে বেশ জমকাল। তাই বলে কিন্তু ভেবে বসো না যে শনির বেড়টা টুপির কানাতের মতো শক্ত। মোটেই তা নয়। এই গ্রহের চারধারে খুদে খুদে যে সমস্ত টুকরো-টাকরা ছুটে চলেছে এটা তা দিয়ে তৈরি।

আমরা আমাদের মহাকাশযানে চেপে এই বেড় ভেদ করে উড়ে যেতে পারি — আকাশ থেকে যখন শিলাবৃষ্টি পড়ে তখন তা ভেদ করে যেমন যাওয়া যায়। কেবল ছোট ছোট দানাগুলো মহাকাশযানের গায়ে ঝমঝম আওয়াজ করে — এই যা। বেড়টা মোট ২০ কিলোমিটার মতন পুরু। তাকে ভেদ করে মহাকাশযানের যেতে সময় লাগবে এক মিনিট।

সৌরপরিবারে শনিই সম্ভবত সবচেয়ে সুন্দর গ্রহ।

শনিরও উপগ্রহ আছে। শনির উপগ্রহগুলোর মধ্যে একটি হল 'টাইটান'। তার আয়তন বুধের সমান। তাকে জড়িয়ে আছে যে বায়ুমণ্ডল তার গঠনপ্রকৃতি পার্থিব বায়ুমণ্ডলের গঠনপ্রকৃতির কাছাকাছি। কে বলতে পারে, হয়ত সেখানে জীবন আছে?

বাকি গ্রহগুলো তেমন আকর্ষণীয় নয়। ইউরেনাস ও নেপচুন বৃহস্পতির মতো। আর প্লুটো একটা ঠাণ্ডায় জমাট গ্রহ, ধু-ধু করছে। সূর্য থেকে ভীষণ দূরে। এত দূরে যে সূর্যের চারধারে একপাক ঘুরতে লেগে যায় ২৫০ বছর। সূর্যকে ওখান থেকে দেখায় শুধু একটা ছোট্ট জ্বলজ্বলে তারার মতন — বলাই বাহুল্য, এক ফোঁটাও তাপ দেয় না।

আমাদের সৌরজগতে প্লুটো হল শেষ গ্রহ।

প্লুটোর পরে শুরু হয়েছে ফাঁকা জায়গা, চলে গেছে সেই তারারা যেখানে আছে সেখান পর্যন্ত।

কিন্তু প্রত্যেকটি তারাই একটা সূর্য। আর দূরের এই সূর্যদের অনেকেরই নিজস্ব গ্রহ থাকা খুবই সম্ভব।

সেই সব গ্রহের কোন কোনটি হয়ত বা আমাদের পৃথিবীর মতন। সেখানে হয়ত লোকজন বাস করে। তারাও হয়ত আমাদেরই মতন।

কিন্তু সে ত অনেক দূরে! আমরা আমাদের প্রতিবেশী গ্রহদের সম্পর্কেই বা এখন পর্যন্ত কতটুকু জানি?
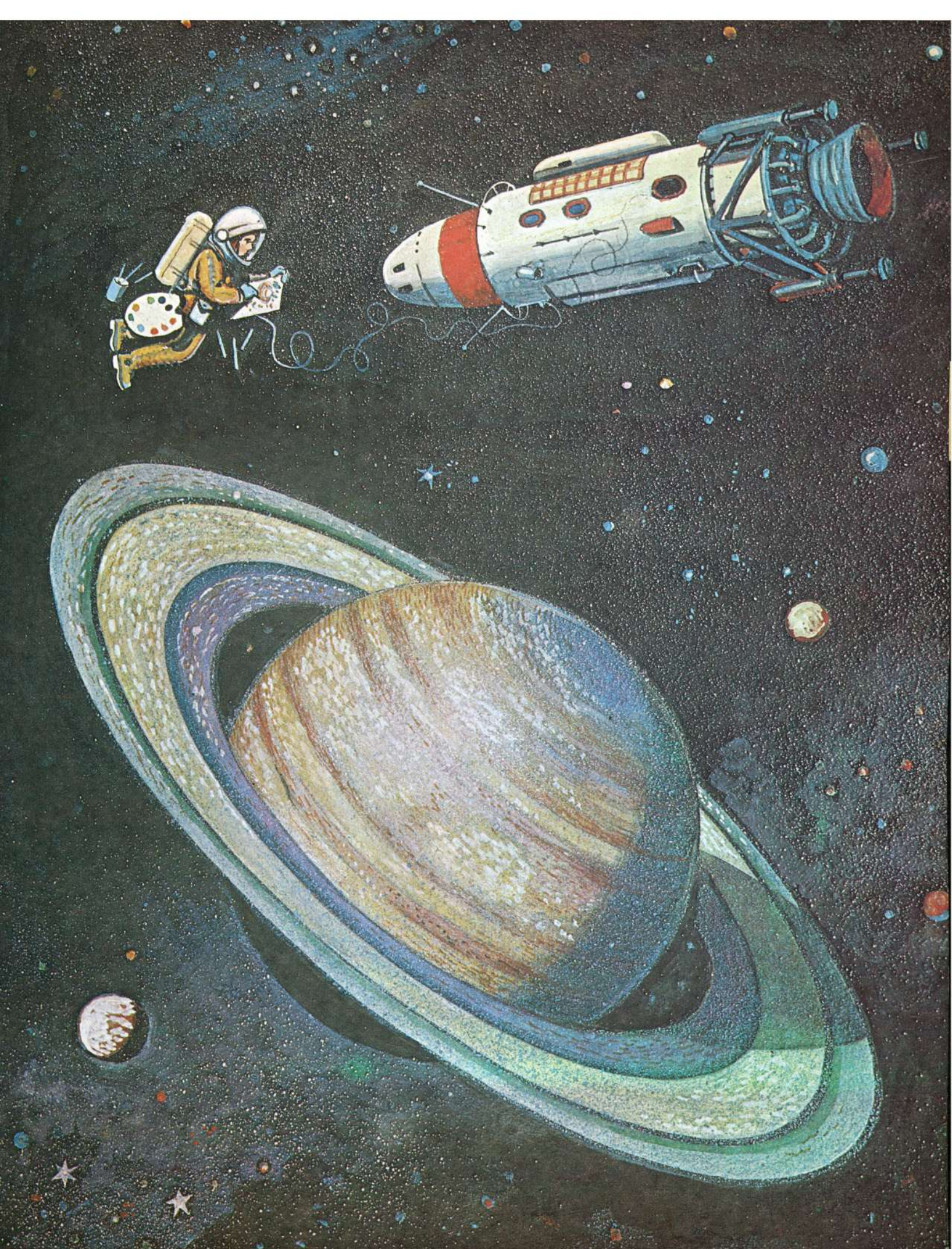
মানুষ কবে অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে আরও জানতে পারবে?

পৃথিবী থেকে শুধু টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহ দেখে দেখে তাদের নিয়ে অনুসন্ধান চালানো কঠিন। মানুষের সব সময় সাধ হত নিজে সেখানে যায়, সব কিছু নিজের হাতে ছুঁয়ে দেখে, নিজের চোখে দেখে, নিজের কানে শোনে, নিজের নাকে গন্ধ নিয়ে দেখে।

কী মজারই না হত যদি আমরা জানতে পারতাম অন্যান্য গ্রহে অন্তত প্রাণের কোন চিহ্ন আছে কি না, অন্তত কোন রকমের উদ্ভিদ বা প্রাণী আছে কি না!

সবচেয়ে বড় কথা, যে কোন গ্রহেই হোক, বুদ্ধিমান প্রাণীর সঙ্গে দেখা করার বড় সাধ হয় মানুষের।

কী রকম হবে সেই প্রাণী? আমাদের মতন? নাকি নয়?

একেকটি গ্রহ এই বিশাল, অকূল মহাকাশের বুকে যেন একেকটি ছোট ছোট দ্বীপ। তাদের মাঝখানে কোটি কোটি কিলোমিটারের ব্যবধান। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে কী ভাবে যাওয়া যায়? কিসে চড়ে?

তোমরা এখন জান যে বেলুন বা এরোপ্লেন কোনটাই এ কাজের উপযুক্ত নয়। বেলুন আকাশে ভাসে। এরোপ্লেন বাতাসে ডানা ভর দিয়ে চলে। বেলুন বা এরোপ্লেন কেবল ততটা উঁচুতেই উঠতে পারে, যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ ঘন বায়ু আছে, যেখানে বায়ুমণ্ডল যথেষ্ট ঘন। কিন্তু যেখানে বায়ুমণ্ডল 'শূন্যে এসে ঠেকেছে', শেষ হয়ে গেছে, সেখানে আর ওড়া সম্ভব নয়। গাছ নিজে যতটা উঁচু, গাছ বয়ে কি আর তার চেয়ে উঁচুতে ওঠা যায়?

গ্রহে যাত্রার একেবারে গোড়ার পথটাই শুধু বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে গেছে। বাকি সমস্ত পথ গেছে মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে। কিন্তু লোকে যেমন নালা-নর্দমা লাফিয়ে পার হয়, তেমনি মহাশূন্যও লাফিয়ে পার হওয়া যায়।

মানুষ অনেক দিন পর্যন্ত জানত না এটা কী ভাবে সম্ভব। জানত না কী ভাবে দৌড়োতে দৌড়োতে গতিবেগ সঞ্চয় করে হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঠেলা মেরে লাফিয়ে অন্য গ্রহে পৌঁছানো যায়। লোকে জানতে পারল তখনই যখন অসাধারণ রুশ বিজ্ঞানী কন্‌স্তান্‌তিন এদুয়ার্দোভিচ ত্‌সিওলকোভ্‌স্কি বললেন যে মহাশূন্য ডিঙিয়ে গ্রহান্তরে যাওয়া যায় একমাত্র রকেটে চেপে।

রকেটে কয়েক মিনিটে বিপুল পরিমাণে জ্বালানি খরচ হয়। কান ফাটানো শব্দে রকেটের নীচ থেকে আগুন বেরিয়ে আসে এবং দানবীয় শক্তিতে রকেটকে ঠেলা মারে সামনের দিকে।

এমনকি রেললাইনের ওপর ভারী ভারী রেলগাড়ি টানার উপযোগী যে সমস্ত ডিজেল ইঞ্জিন আছে মহাকাশগামী একটা ছোটখাটো রকেটও তাদের কয়েক হাজার গুণ শক্তিশালী!

এহেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ায় ভারী রকেট অবলীলাক্রমে মাটির টান ছেড়ে ওপরে উঠে পড়ে, অতি দ্রুত তার গতিবেগ বাড়তে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে রকেট মেঘ ভেদ করে বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে মহাকাশে বেরিয়ে আসে। সেখানে, মহাশূন্যতার মধ্যে কোন রকম বাধা না

থাকায় প্রমত্ত বেগে ধেয়ে চলে! সেই সময় তার গতিবেগ হয় আমাদের আধুনিক 'তু-১৫৪' যাত্রিবাহী জেটপ্লেনের ৫০ গুণ দ্রুত।

এরকম অবিশ্বাস্য গতিতে পৃথিবী ছাড়ার পর রকেট স্তব্ধ হয়ে যায়। 'লাফ' দেবার পর এখন সে ফাঁকা মহাকাশে উড়তে থাকবে খাতের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দেয়া ঢিলের মতো।

ঢিল সরল রেখায় না গিয়ে ধনুকের মতো হয়ে মাটির দিকে বাঁক নেয়। রকেটও মহাকাশে সরল রেখায় ওড়ে না, উড়তে উড়তে সূর্যের দিকে বাঁক নেয়। তাই রকেট এমন ভাবে ছাড়তে হবে যাতে বাঁক নিয়ে শেষ পর্যন্ত যেখানে দরকার ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে পড়ে। ভুলে যেয়ো না, যে-গ্রহটা তোমার লক্ষ্যস্থল সেটাও কিন্তু এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই। সেটা সূর্যের চারধারে ঘুরছে। তার মানে ফাঁকা জায়গাকে নিশানা করে এমন ভাবে হিসেব করতে হবে যাতে রকেট উড়তে উড়তে কয়েক মাস পরে এই জায়গাটায় এসে গ্রহের সঙ্গে মিলতে পারে। মোটকথা, কাজটা দারুণ জটিল। কিন্তু মানুষ এ কাজে সক্ষম হয়েছে।

মাত্র প্রায় তিন দশক আগে, ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত মহাকাশবন্দর বাইকোনুর থেকে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। ১৯৫৯ সালেই মানুষ অন্যান্য গ্রহে মহাকাশযান পাঠানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। মানুষ প্রথম 'আকাশের চাঁদ হাতে ধরল' — সোভিয়েত স্টেশন 'লুনা-২' সেখানে একটা প্রতীক নিশান পাঠায়। এর পর থেকে সোভিয়েত ও মার্কিন আন্তঃমহাকাশ স্বয়ংক্রিয় স্টেশনগুলো একের পর এক মহাকাশ চষতে থাকে।

গত আড়াই দশকের মধ্যে ঐ সমস্ত স্বয়ংক্রিয় স্টেশন চাঁদ, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির কাছাকাছি যায়, নিজেদের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে কাছাকাছি দূরত্ব থেকে গ্রহগুলোর ওপর অনুসন্ধান চালায়, তাদের ছবি তোলে, বেতারে আমাদের কাছে কাজের ফলাফল ও চমৎকার-চমৎকার ছবি পাঠায়।

চাঁদ, শুক্র ও মঙ্গলের বুকে মহাকাশযান নিরাপদে অবতরণ করে সেখানকার মাটি ও বায়ুমণ্ডলের গঠনপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছে, আশেপাশের এলাকার ছবি তুলেছে। ঐ সমস্ত জায়গায় তারা প্রাণের লক্ষণ খুঁজে বেড়িয়েছে। চাঁদ থেকে পাহাড়ি খনিজ পদার্থের নমুনা পৃথিবীতে পাঠিয়েছে।

কিন্তু তার অর্থ মোটেই এই নয় যে আজ যে-কোন মানুষ বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়াই রকেটে চড়ে মঙ্গল বা ঐরকম কোন গ্রহে যাত্রা করতে পারে।

পৃথিবী — মঙ্গল
পৃথিবী — বুধ
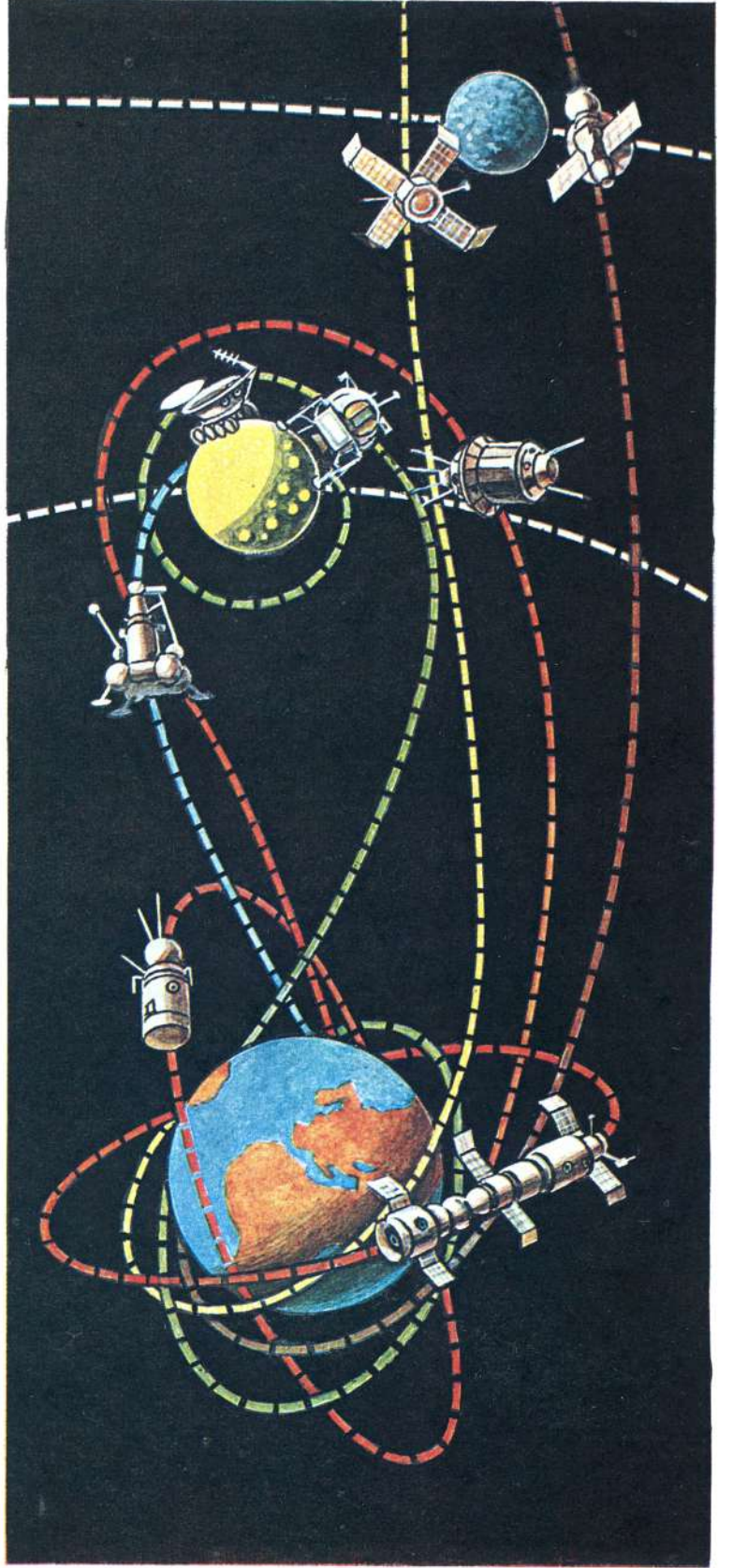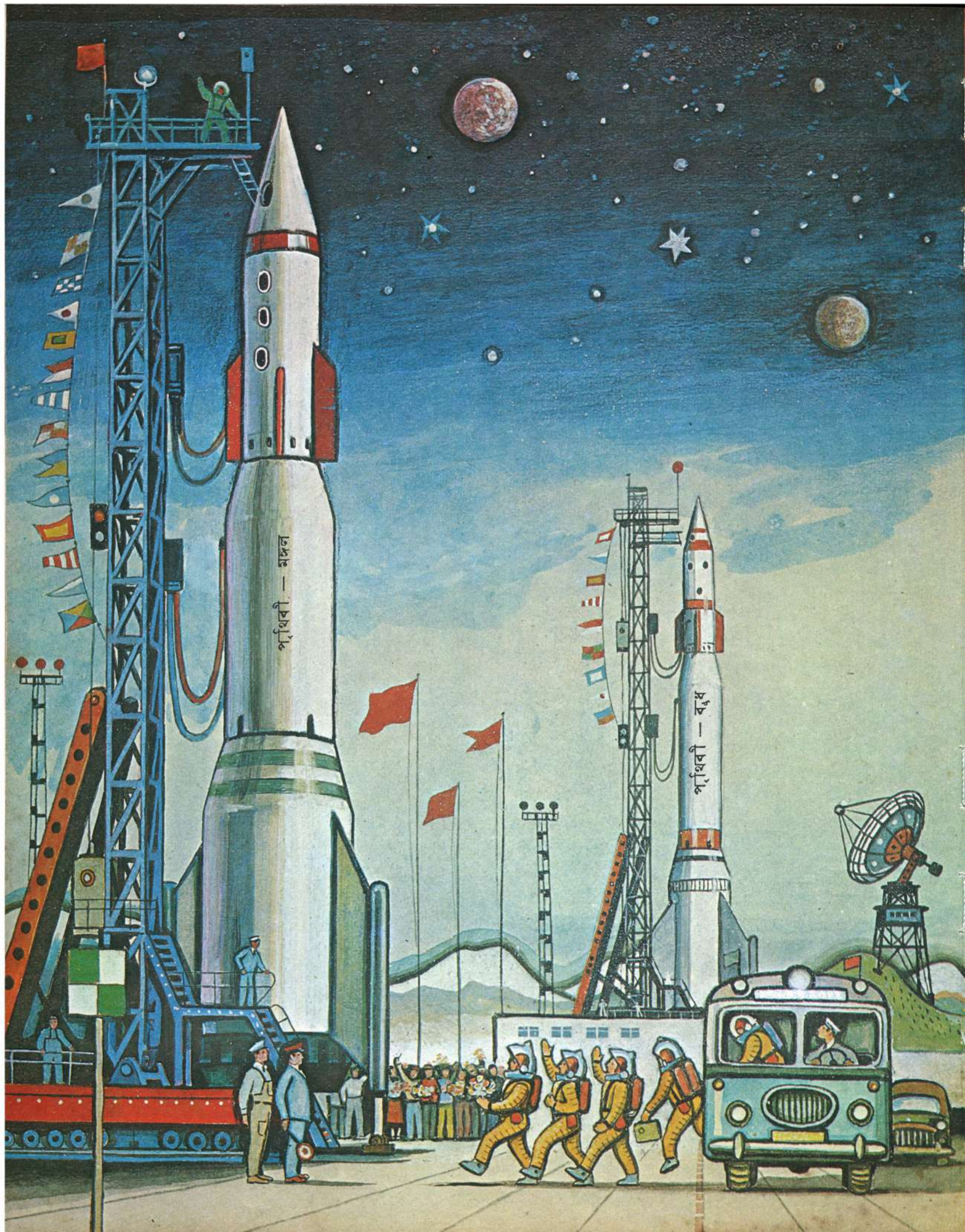
মানুষ বড় কোমল, ঠুনকো জীব। পৃথিবীতে কোন মহামূল্যবান মাছকে জ্যান্ত কোথাও পাঠাতে গেলে তার পেছনে যেমন যত্ন নিতে হয় মানুষকে মহাকাশে পাঠাতে গেলেও সেইরকম যত্ন নিতে হয়। মাছটাকে রাখতে হয় একটা জলভরা কাচের বয়ামে, জল যাতে না ছলকায়, যাতে বেশি গরম না হয়ে যায়, নোংরা না হয় সেই দিকে রীতিমতো নজর রাখতে হয়। মাছকে খাবার দেওয়ার কথা ভুললে চলবে না।

মানুষের কাছে মহাকাশযান হল 'বাতাস ভরা বয়াম'। এই বয়ামের ভেতরকার মানুষকে নিয়ে যে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় সেই তুলনায় বয়ামের মাছ নিয়ে ঝঞ্ঝাট অনেক কম।

এই কারণে মানুষ একেবারে শুরু থেকে যতটা সম্ভব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিকে মহাকাশের হালচালও দেখে আসার ভার দেওয়া হয়। মানুষ ত আর না জেনেশুনে জলে ঝাঁপ দিতে পারে না! খামোকা ঝুঁকি নিতে যাবে কেন? স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি হালচাল দেখেশুনে আসার পর তাদের খবরের ভিত্তিতে, দরকার হলে এবং সম্ভব হলে তবেই মানুষ যাত্রা করতে পারে।

১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল মানুষ প্রথম মহাকাশযাত্রা করল। মানুষের ইতিহাসে প্রথম মহাকাশযাত্রা করলেন সোভিয়েত মহাকাশচারী ইউরি গাগারিন।

১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই চাঁদে প্রথম মানুষের পদার্পণ ঘটল।

মহাকাশে ডকিং-এর কাজেও মানুষ হাত পাকিয়েছে। এই ডকিং ছাড়া মহাকাশে দূর দূর পথ পাড়ি দেওয়া অসম্ভব।

পৃথিবীর কক্ষপথে সোভিয়েত 'সাল্যুত', মার্কিন 'স্কাইলাব' এবং সোভিয়েত-মার্কিন 'সয়ুজ-অ্যাপলো' স্টেশন ছাড়া হয়। কক্ষপরিক্রমাকারী সোভিয়েত যন্ত্রসমাহার 'সাল্যুত-সয়ুজ' এখনও পুরোদমে কাজ করে চলছে। সেগুলোতে অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশচারীরা দূরে দূরে যাত্রার কৌশলাদি উদ্ভাবনেরও চেষ্টা করছেন।

এ সবই অন্যান্য গ্রহের ওপর চূড়ান্ত অভিযান চালানোর প্রাথমিক পদক্ষেপমাত্র।

অদূর ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন রকমের এবং জটিল থেকে জটিলতর আন্তঃগ্রহ স্বয়ংক্রিয় স্টেশন বুধ, শুক্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতির দিকে যাত্রা করবে। তারা ওখানকার হালচাল দেখেশুনে আসবে। এরপর ওখানে মানুষের জন্য কী অপেক্ষা করছে সঠিক ভাবে অবহিত হয়ে তবেই মানুষ নিজে ঐ সমস্ত গ্রহে যাত্রা করবে।

কিন্তু যে কোন গ্রহে প্রথম পরিদর্শন হবে সেই গ্রহের ওপর বিশদ ও সত্যিকারের অনুসন্ধানের সূচনামাত্র। আমাদের নিজেদের গ্রহ এই যে পৃথিবী, তাকে নিয়েই ত আমরা আজ হাজার হাজার বছর ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছি, অথচ আজ র্যন্ত আমরা তার অনেক কিছুই জানতে পারি নি। তাহলে অন্যান্য জগৎ সম্পর্কে আর কী বলার আছে?

ঐ সব গ্রহকে ভালোভাবে জানতে বহু সময় লাগবে। বহু বছর ধরে শত শত অভিযান সেখানে চালানো হবে, হাজার হাজার গবেষক যাবে।

চাইলে তোমরাও তাদের সঙ্গে ভিড়তে পার।

মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। এটা খুবই ভালো!
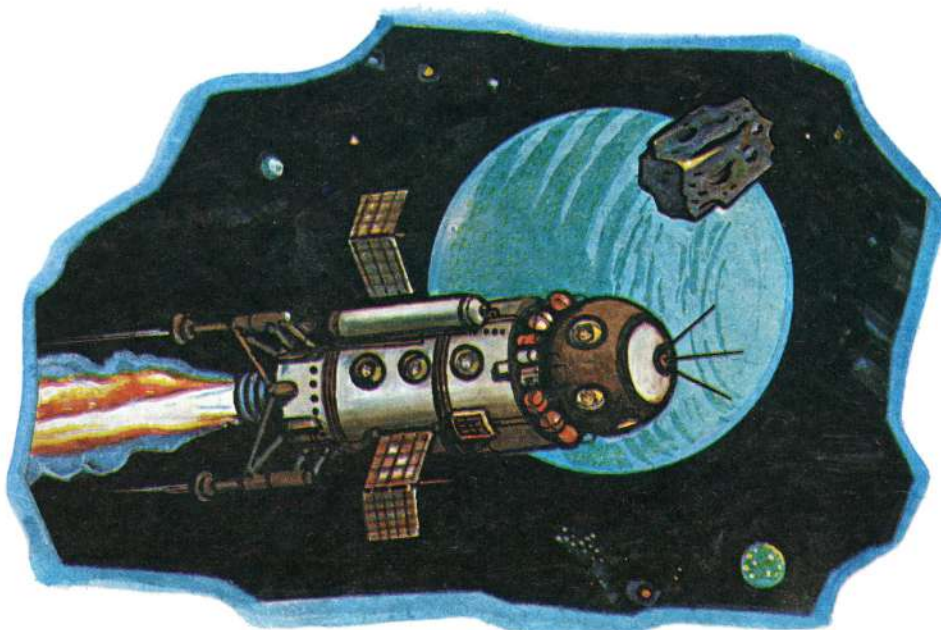
সূচী

পৃথিবীর শেষ কোথায়? ৩
আকাশের তারা এত সুন্দর কেন? ৮
আকাশ কি ছেঁদা করা যায়? ১৪
সূর্য আর চাঁদ কিসে তৈরি? ১৭
মহাকাশের বস্তুপুঞ্জের অবলম্বন কী? ২১
সূর্য কেন উদয় হয়, কেনই বা অস্ত যায়? ২৪
গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ বেশি কেন? ২৯
চাঁদ কেন ফালি? ৩৫
চাঁদে কী আছে? ৩৭
গ্রহ কী? ৪২
বুধগ্রহে নামা যায় কি? ৪৮
শুক্রগ্রহে আমরা কী দেখতে পাব? ৫১
মঙ্গলগ্রহে মঙ্গলবাসী আছে কি? ৫৬
বৃহস্পতি আর শনি কেমন? ৬২
মানুষ কবে অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে আরও জানতে পারবে? ৬৬

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

П. Клушанцев

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ТЕЛЕСКОП

На языке бенгали

Pavel Klushantsev

ALL ABOUT THE TELESCOPE

In Bengali

স্কুলের মাঝারি বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য